Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন যখন সাহিত্য

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Seraj Salekeen
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.1
Pages	৯-৪২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন যখন সাহিত্য

Check for updates

সিরাজ সালেকীন*

এক

তিনটি উপন্যাস, চারটি ছোটগল্প, একটি উপন্যাসের অনুবাদ, কয়েকটা কবিতা-প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও লোকসাংস্কৃতিক সংগ্রহ নিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের [১৯১৪-১৯৫১] সাহিত্যিক জীবন। তিতাসপাড়ের মৎস্যজীবী মল্লবর্মণ বা মালো পরিবারের সন্তান অদ্বৈত কেবল পেশার অভিজ্ঞতা নয়, দারিদ্র্য ও ব্রাত্যজনের প্রান্তিকতাবোধও লাভ করেছিলেন শৈশবাবধি। অদ্বৈতরা তিন ভাই ও এক বোন; শৈশবেই হারিয়েছেন পিতামাতা, দুই ভাই; যৌবনের সূচনায় এসে, ১৯৩৪ সালে কলকাতায় বসবাস শুরুর আগেই হারিয়েছেন একমাত্র বোনটিকে। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনগতির সম্পর্ক অনুধাবনের ব্যাপারটি অদ্বৈতের ক্ষেত্রে তাই জৈবিক, রক্তমাংসে গেঁথে যাওয়ার মতো ব্যাপার। আর আছে পরিপার্শ্বের ক্ষমতার চর্চা — ধর্ম-বর্ণ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, আরেক রূপ প্রকৃতিতে অপ্রতিরোধ্য — জলে ও ডাঙায়; প্রত্যক্ষ উৎপাদন নয় এমন সংগ্রহের পেশায় প্রাকৃতিক নিয়মে চলে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত — আর সমাজেও অর্থনীতির কেন্দ্র তো বহুদূর, এর তল খুঁজে পায় না মালোরা। সম্ভবত এ কারণেই অদ্বৈত স্বভাবত চাপা, সলজ্জ ও বিব্রত। মালোদের পেশার সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে অনিবার্য নয়, অথচ ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী হওয়ায় মালোসমাজই এবিষয়ে সম্মিলিতভাবে অদ্বৈতর দায়িত্ব গ্রহণ করে। সম্মিলিত এই বোধে সম্ভবত বহুমাত্রিক মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রকাশ পায়। প্রত্যক্ষ একটি কারণ ছিল, লেখাপড়া জানা থাকলে মহাজনের খাতার লেখায় তাদের প্রতারিত হওয়া প্রতিহত করা যাবে অর্থাৎ ততদিনে 'কালা আখরের' মূল্য সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং মালোরাও তার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছে। আমরা জানতে পাই, দৃঢ়চিত্তের অদ্বৈত এই শুভচেতনার প্রতিদান দিতে চেষ্টা করেছেন উত্তরকালে, কলকাতায় বসবাসকালে তাঁর সামান্য রোজগারের কিছু অংশ তিতাসপাড়ের মালোপাড়ার স্কুল চালানোর জন্য খরচ করতেন।

মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৯২৭ সালে বৃত্তি নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা হাইস্কুলে ভর্তি হন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ১৯৩২ [১৯৩৩?] সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং পড়াশোনার সুবিধার্থে একটি পরিবারে তাঁর লজিং-এর ব্যবস্থা হয়। সেই পরিবারের মেয়ে কল্পনা দে রায় বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হলে অদ্বৈতকে আশ্রয়টি ত্যাগ করতে হয়। কল্পনার গ্রেফতারের সঙ্গে অদ্বৈতর লজিং-ত্যাগের প্রত্যক্ষ যোগ না-থাকারই কথা। শোনা যায়,

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অদ্বৈতও স্কুল-জীবনের শেষদিকে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে, কল্পনার সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্কিত ব্যাপারটি বাস্তবানুগ নয়। লজিং হারিয়ে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য তাঁর পক্ষে পড়াশুনা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। সে সময়, ১৯৩৪ সালে, তিনি সন্তান প্রেসের মালিক জিতু দত্তের পরামর্শে জীবিকার সন্ধানে পড়াশোনায় ছেদ ঘটিয়ে কলকাতায় পাড়ি জমান। কলকাতা-জীবনের শুরুতে তিনি ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার মুখপত্র 'ত্রিপুরা'য় যোগ দেন, এরপর ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের মালিকানায় প্রকাশিত 'নবশক্তি' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ব্যাঙ্কার নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্তী শ্রীকাইল অঞ্চলের ধনাঢ্য জাতীয়তাবাদী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। দত্ত পরিবার প্রতিষ্ঠা করেছিল 'বেঙ্গল ইমিউনিটি' নামের ওষুধ কোম্পানি; কোম্পানির বিভিন্ন ছাপার কাজের জন্য প্রথমে একটি প্রেস ক্রয় করা হয়। কোম্পানির পাবলিসিটি ইনচার্জ ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সম্ভবত তাঁরই প্রেরণায় 'নবশক্তি' ক্রয় করা হয় এবং তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পান। মূলত অদ্বৈতই পত্রিকা দেখাশোনা করতেন, সঙ্গে সাগরময় ঘোষও ছিলেন। এই পত্রিকাকে ঘিরে কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষের একটি বলয় তৈরি হয়। এসময় অদ্বৈত ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন — কেবল নিজের ও দুটো ছোট ভাগ্নের পারিবারিক দায় বহনের জন্যই নয়, গোষ্ঠীচেতনার কারণেও। চাকরিতে যোগদানের পেছনে অর্থনৈতিক চাপ কিংবা রাজনৈতিক কারণ সক্রিয় থাকতে পারে বা দুটোই একসঙ্গে। তবে জাতীয়তাবাদী আগ্রহ অস্বীকার করা যায় না। সে সময় তিনি লিখতেন প্রচুর। ১৯৩৮ সালে অদ্বৈত 'নবশক্তি'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। এসময় তিনি লোক-সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে কিছু নিবন্ধ রচনা করেন। এই আলোচনা বা অনুসন্ধানগুলো তাঁর চেতনায় সম্ভবত *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাস রচনার রসদ হিসেবে জমা হচ্ছিল — তাঁর সংগৃহীত 'বরজের গান'-এর কাহিনি, 'মাঘমণ্ডল' ও বারমাসী রচনার তথ্যাদি উপন্যাসটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৪১ সালে 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে গেলে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সহায়তায় অদ্বৈত মাসিক 'মোহাম্মদী'তে চাকরির সুযোগ পান; তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় কাজ করেন পরবর্তী তিন বছর। অদ্বৈতর এই অবস্থান সম্পর্কে একজন আলোচক কিছুটা ভিন্ন ইঙ্গিত করেন, যা দ্ব্যর্থকতা তৈরি করে :

> মুসলিম জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা এবং জাপানি বোমার ভয়ে ত্রস্ত কলকাতার মহানাগরিক পরিস্থিতি অদ্বৈতের চিন্তাজগতে কী ধরনের আবর্ত তৈরি করেছিল, এ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। কিন্তু একটানা তিন বছর যে টালমাটাল দিনগুলিতেও তিনি দৈনিক 'আজাদ' ও মাসিক 'মোহাম্মদী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারলেন, তাতে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা, নিম্নবর্গীয়জনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে সাম্প্রদায়িক জটিলতার স্থান খুব অল্প। দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত হয়ে যিনি জীবিকা ও সংস্কৃতিকে সর্বতোভাবে একই বৃন্তে দুটি ফুল করে তুলেছেন, তাঁর কাছে সমস্তই ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে উত্থাপিত কিছু দৃশ্যমাত্র। তবু যে মাসিক 'মোহাম্মদী'র চাকরি তাঁকে ছাড়তে হল, এর কারণ পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত বিরোধ। [তপোধীর, ২০০০ : ৭-৮]

অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতো প্রান্তিক মানুষদের ধর্মসাম্প্রদায়িক মূল্য কি ভারতীয় সমাজে সমকালে ও পূর্বকালে স্বীকৃত হয়েছে? সনাতন সমাজ কি কখনোই একটি একক জাতি-

পরিচয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বা অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল? বাংলায় কি চণ্ডালদের পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থনের মতো ব্যাপার ঘটেনি? এইসব প্রশ্নের অন্তর্নিহিত জবাব দিতে গেলেই একজন মল্লবর্মণের সাম্প্রদায়িক অস্বীকৃতির বা সমকালীন হানাহানিতে মানসিকভাবে যুক্ত না হবার কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

'মোহাম্মদী' পত্রিকায় *তিতাস একটি নদীর নাম* [শ্রাবণ ১৩৫২/১৯৪৫] উপন্যাসটির সাত কিস্তি প্রকাশিত হয়। সে সময় পত্রিকায় প্রকাশিত 'রক্তনিশান' শিরোনামের চারটি কবিতা নিয়ে রাজরোষের ব্যাপার ঘটায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের সূচনা হয় এবং পরিণামে চাকরি ত্যাগ করেন অদ্বৈত। এজন্যই সম্ভবত উপন্যাসটি আর 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়নি। কবি ফররুখ আহমদের প্রচেষ্টায় উপন্যাসটি 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং এর কিছুদিন আগে তিনি কবির *সাত সাগরের মাঝি*র মুদ্রণ ব্যাপারে যুক্ত হয়েছিলেন [শান্তনু, ১৯৮৭ : ১৪]। অদ্বৈত ১৯৪৫ সালে 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দেন। এরই মধ্যে দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো ব্যাপারগুলো ঘটছে বাংলায়। এসব ঘটনাপ্রবাহে উচ্চবর্গ বা বর্ণের স্থিতিলাভের পরিসর থাকে অনেকখানি, কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সরাসরি উন্মূলিত হয়। প্রান্তিক বর্গ ও বর্ণ হিসেবে তিতাসপাড়ের মালোর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তাদের অনেকেই তখন কলকাতায় উদ্বাস্তু; তাদের সঙ্গে বাস করছেন অদ্বৈত, তাদের অর্থ-সহায়তার জন্য অতিরিক্ত কাজ করছেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগে। এমনিতেই সামান্য বেতন, তার থেকেই অন্যদের সহায়তা এবং থাকা-খাওয়ার অনিশ্চয়তা-অনিয়ম যে দৈহিক অপুষ্টির ব্যাপার ঘটায় তার কার্যকারণে তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন 'আনন্দবাজার' পত্রিকার উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক সহায়তায়; কিন্তু তিতাসপাড়ের মানুষদের সহায়তার জন্য একদিকে, অন্যদিকে স্মৃতিময় রক্তক্ষরিত রচনা *তিতাস একটি নদীর নাম* পরিমার্জনের জন্য তিনি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসেন। যেন উপন্যাসটির নতুনতর রূপ তৈরির জন্যই তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। এই কাজ সমাপ্তির পর ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বড়ো নিঃসঙ্গ সেই মৃত্যুর মুহূর্ত, চিলেকোঠায় সবার অগোচরে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জীবন অথচ দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং একরকম কাঙ্ক্ষিত [!] স্বাধীন দেশের সূচনা এই জীবনকালের ভেতরেই। জীবনের অনেকখানি তাপ আসে সময় থেকে; ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে মালোজীবনের অভিজ্ঞতায় তো অদ্বৈত বিশিষ্টই। জীবনানন্দ দাশের মতো বলা যায়, উপন্যাস — সকল সাহিত্যকর্মই — ব্যক্তির আত্মজৈবনিক বৈভব, বৈচিত্র্য ও বৃত্তান্ত প্রকাশ করে [জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ১৮৬]। তাহলে অদ্বৈত তাঁর পরিচয়ের তলটি কোথায় খুঁজে পেয়েছিলেন? নিশ্চয় গোকর্ণঘাট থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটি যাত্রাপথ আছে? শিক্ষা, বিশেষত শিক্ষানির্ভর ভদ্রলোকের কলকাতার জীবন কি সরল অর্থনীতির মালোজীবনের সঙ্গে কোনো বিরোধ তৈরি করে না? গোকর্ণঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও কলকাতা তো কোনো অবিচ্ছিন্ন সরলরেখা নয়, বরং এই যাত্রা ও অবস্থান বহুকৌণিক, বহুস্তরিক এবং পরস্পর সমান্তরাল হওয়াই স্বাভাবিক। এই চলার পথের স্তরে স্তরে পদে পদে ফাঁদ পাতা থাকে। স্কুলজীবনেই অদ্বৈতর সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, এর সূচনা ঘটে কবিতা লেখার মাধ্যমে; পুরস্কারও পেয়েছিলেন কবিতা লিখে। আর বিপ্লবীকালের ইঙ্গিতে বন্ধু সুবোধ চৌধুরী জানাচ্ছেন, সময়টা তখন নজরুল-

প্রভাবিত, কুমিল্লা অঞ্চলে বিশেষভাবে। নজরুলও প্রান্ত থেকে এসে শিব-সাধনা করেছেন আসচেতন-জীবন অথচ তল পাননি, অনেকখানি সময় গেছে গ্রামোফোন রেকর্ডে, 'ভদ্রলোকে'র ফ্যাশনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে। তখন রাজনীতি প্রত্যক্ষে নিয়ন্ত্রণ করছে এই ভদ্রলোকদের দ্বারা উচ্চারিত 'জাতীয়তাবাদ'। মালোর সন্তান, শিক্ষা যখন সমাজের যৌথ প্রযোজনা তখন অবস্থান হারানোর ভীতি অস্বাভাবিক নয়; এজন্যই সম্ভবত ১৯২৮-২৯ সালে স্কুলের ধর্মঘটে যোগ দিতে পারেননি অদ্বৈত বৃত্তি হারানোর ভয়ে এবং যোগ না দিয়ে মর্মযাতনায় কেঁদেছেন [সুবোধ, ১৯৯৯ : ৭]। এই যন্ত্রণা কমবেশি সকল ভদ্রলোকেরই হওয়ার কথা অথচ ধুরন্ধরেরা চোখের জল শুকিয়ে ফেলে এবং ক্ষমতার হাত ধরে নিশ্চিন্তে চলতে পারে। সংকট তৈরি হয় সংবেদনশীল মানুষের জন্য এবং এই সংকট ধারণ ও তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে গেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে। এমনই কার্যকারণে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভদ্রলোকদের একাংশ আত্মসন্ধানে জনমানুষের সংস্কৃতির দিকে যাত্রা করেছে, অপরাংশ পুঁজির গতির বিভঙ্গে অর্থাৎ শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরেই পড়ে। সম্ভবত প্রান্তজনের জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে অদ্বৈত 'নবশক্তি'তে যোগ দিয়েছিলেন; আঞ্চলিকতা, নব্য উদার মানববাদের ধারক অর্থনীতির কুহক ছড়ানো জাতীয়তাবাদ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু আরেক প্রবণতায় সমকালীন সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি অবগত থাকার পাশাপাশি তাঁর অঞ্চলের লোকায়ত জীবনকেও অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লোকসাংস্কৃতিক বিভিন্ন লেখায় ও সংগ্রহে। নগর ও গ্রামের কেবল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় নয় অর্থনৈতিক পার্থক্যও তিনি অনুভব করেন; লোকজীবনের সহজাত শুদ্ধতা নিয়ে তিনি 'দুইটি বারমাসী গান' নিবন্ধে লেখেন : 'শিক্ষিত সমাজের মত মহলা দিয়া বা বৈঠক বা আসর গুলজার করিয়া ওস্তাদি লাইনের গান চর্চা করিবার মত সময়, সঙ্গতি এবং ক্ষমতা তাহাদের এতটুকুও নাই। তাহারা গান গায় কাজ করিতে করিতে। প্রাণের সহজ স্ফূর্তিতে...' [অদ্বৈত, ২০০০ : ৭০]। অদ্বৈতর লোকসাহিত্য সংগ্রহের মনস্তত্ত্বেই প্রান্তজনের রাজনৈতিক-সংস্কৃতির প্রতি সম্পৃক্ততা ও অহং প্রকাশ পায়। সূক্ষ্ম একটা বিরোধ ও গোষ্ঠীগত অহং তিনি নাগরিক জীবনের ভেতর বাঁচিয়ে রাখেন, বাঁচিয়ে রাখেন জনমানুষের সম্পৃক্ততার বোধ। 'পল্লীসঙ্গীতে পালাগান' নামক নিবন্ধে লোকসাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন আন্তরিক জীবন অনুভবের উপর : 'নিরক্ষর পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিশিতে হইবে, ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হইবে' [অদ্বৈত, ২০০০ : ৭৭]। এর দ্বারা অদ্বৈত কি আত্মপরিচয়ের সূত্রগুলো গেঁথে তুলবার অনুশীলন করছিলেন? নাগরিক রাজনীতি যে দূরত্ব ও তত্ত্ব, শ্রেণি ও কর্তৃত্ব তৈরি করে তা-যে অদ্বৈত বুঝতেন না এমন নয়। যে কোনো সুস্থ মানুষই দারিদ্র্যের ভাগাভাগি করতে পারে কিন্তু দীনতা বা ভণ্ডামির ভাগাভাগি করতে না চাওয়াই ন্যায্য। এজন্য সরল কল্যাণের পথ তাঁকে আকৃষ্ট করে, 'বরজের গান'-এ এমন মানবিক সাম্যের প্রতি লক্ষ রেখে লেখেন :

> গানটিতে একটি লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, হিন্দু সমাজের যে অস্পৃশ্যতা সম্প্রতি কালের কুটিল গতি অনুসারে অভিশাপ হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহার চিন্তা সেকালের লোকেরাও করিত। অনুন্নতগণ চোখ বুজিয়া নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিলেও তাহাতে তাহাদের মন সায় দিত না। এই জন্যই হয়ত কোন ব্রাহ্মণেতর জাতির পল্লীকবি প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে এই

> ব্রাহ্মণ নন্দনকে মালীনন্দিনীর নিকট 'জাতিনাশ' করাইয়া গানটি রচনা করিয়াছে। ইহার ঠিক উল্টা পরিকল্পনা যে রচয়িতার মগজে আসে নাই তাহাতে তাহার নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ ভক্তির নিদর্শন রহিয়াছে। [অদ্বৈত, ২০০০ : ৮৯]

হয়ত মূলেই আঘাত করতে চান অদ্বৈত, একটু ভিন্নভাবে। মাটির কাছাকাছি মানুষের মনের খবর না জেনে তার কল্যাণ করা যায় না; তাই একটু শ্লেষাত্মকভাবেই যেন অদ্বৈত রাজনীতি বিমুখতার প্রত্যক্ষ চিহ্ন রেখে দিয়েছেন তাঁর কর্মকাণ্ডে। অথচ বিশ্বসাহিত্য ও রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল ঈর্ষণীয়। এর ব্যবহারও ভিন্নভাবে করেছেন; ১৯৩৮ সালে পার্ল বাক্ চীনের জীবন নিয়ে লেখা গুড *আর্থ*-এর জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ভারতীয় সমাজসচেতনতা ও নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই *ভারতের চিঠি — পার্ল-বাককে* রচনা করেন। চৈনিক কৃষকের সঙ্গে তিতাসপাড়ের কৈবর্তদের মিল তিনি নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছেন। তাহলে তো প্রত্যক্ষভাবেও অদ্বৈতর মনে রাজনীতি ছিল এবং তা প্রকাশ পেয়েছে, প্রথমত জাতীয়তাবাদী ধারার স্বাধীনতা লাভ, দ্বিতীয়ত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি, সামগ্রিক আত্মিক মুক্তির সূত্র ধরে। অথচ অন্তরঙ্গ অন্তত একজন সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণ সমকালে কমিউনিস্টদের ভূমিকাকে দেখতেন সমালোচনার চোখে [সাগরময়, ১৯৯৯ : ১৫]। সে সময় জাতীয়তাবাদী ঘরানার পত্রিকা 'আনন্দবাজারে' কাজ করেছেন নিবিষ্ট চিত্তে কিন্তু সেখানে কোনো আড্ডায় যুক্ত হননি অদ্বৈত [জ্যোতিষ, ১৯৯৯ : ১৬]। তিনি কখনো 'আনন্দবাজারে'র শনিবারের সাহিত্য আড্ডাতেও যাননি, অথচ তিনি অন্যত্র যে আড্ডা দিতেন এমন উল্লেখ করেছেন সুবোধ চৌধুরী ও সাগরময় ঘোষ। অদ্বৈত যেতেন মুক্তধারার সংঘে বা আড্ডায়, সেখানে প্রধানত বামপন্থীরাই আসতেন। এরও নিশ্চয় কোনো গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে।

দুই

মানুষ তো প্রথমত ব্যক্তিই; এই ব্যক্তিই যখন সময়, সমাজ, অর্থনীতি বা অপর ব্যক্তির সংস্পর্শে বা সম্পর্কে আসে তখনই রাজনীতির স্রোতে নামে। তাই মানবজীবনে এই পরিণাম নিয়তির মতো। অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতো রূপান্তরিত ও স্থানান্তরিত মানুষের জীবনে এর প্রক্রিয়া ও প্রভাব বেশ জটিল। প্রথমত তিনি তাঁর আদি পেশা, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত-বিচ্ছিন্ন বা উন্মুলিত অথচ অন্তরে এগুলোর জৈবিক প্রবাহ বহন করে চলেছেন; দ্বিতীয়ত আহৃত ভাবাদর্শ, যা জায়মান বা চোলাইকৃত, তাও রক্তে মিশতে থাকে এবং তা কালের গতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে। এর টানাপড়েন স্বাভাবিক, আপাতভাবে তা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই, অদ্বৈত মল্লবর্মণও তা থেকে মুক্ত নন। প্রথমে *রাঙামাটি* ও *শাদা হাওয়া* উপন্যাস দুটি আলোচনার মাধ্যমে এই প্রবণতাটি অনুধাবনের চেষ্টা করব আমরা।

রাঙামাটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালে অচিন্ত্য বিশ্বাস আভ্যন্তর সাক্ষ্য ও পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির যোগসূত্র মিলিয়ে অনুমান করেছিলেন এটি ১৯৩৮-১৯৪১ সালের মধ্যে রচিত হতে পারে। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণের *রচনাসমগ্র*র ভূমিকায় মডেল ফার্মের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৪৩ সালের পূর্বে নয় বলে জানান [অদ্বৈত, ২০০০ :

XIV]। কেননা 'মডেল ফার্ম এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.' সে-সময় কোম্পানি হিসাবে নথিভুক্ত হয় এবং এটি কাজের অধিকার পায় ১৯৪৫ সালে। অচিন্ত্য বিশ্বাসের মতে, এই রচনার জন্য মল্লবর্মণ মডেল ফার্মের কর্মকাণ্ড দ্বারা উৎসাহিত হয়েছেন, বিশেষত তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ও থাকতে পারে নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে পূর্বাশা কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং সূত্রে। তিনি আরো মনে করেন, উপন্যাসটির রেণুকা চরিত্রটির সঙ্গে মডেল ফার্ম কোম্পানির অন্যতম পরিচালক জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তের সামান্য মিল থাকা সম্ভব। এসব অনুমান। তবে উপন্যাসটির আভ্যন্তর সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় — এতে বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ নেই; জাপানি এক আদর্শ গ্রামের উল্লেখ উপন্যাসে আছে যা লন্ডনের 'ইলাসট্রেটেড উইকলি'তে প্রকাশিত হয়; উপন্যাসটিতে রাশিয়া ও জাপানে কৃষিপদ্ধতি শিক্ষার উল্লেখ আছে, বিশেষত যৌথ খামারের ধারণা রাশিয়া বিপ্লবের পরেই গ্রহণ করেছিল এবং এ সম্পর্কে পড়াশোনাও মল্লবর্মণের ছিল — সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচনার পূর্বেই বা কাছাকাছি সময়ে এটি রচিত। ১৯৪১ সালে বন্ধ হওয়া 'নবশক্তি'র ম্যানেজার যদি এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি অফিসে পেয়ে থাকেন তবে তার রচনাকাল উল্লিখিত সালের পরে হতে পারে না। এই হিসাব মাথায় রেখে বলা যায় অচিন্ত্য বিশ্বাসের দ্বিতীয় অনুমান উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৪৩-১৯৪৫ সালের মধ্যে নয়, তাঁর আগের মতেরই কাছাকাছি হওয়া সম্ভব। তপোধীর ভট্টাচার্য [২০০০ : ৫৫] মনে করেন, এর রচনাকাল হতে পারে ১৯৩৮-৩৯ সাল। এই কালপর্বে বাংলার রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষ বিপ্লবী উপাদান যুক্ত হচ্ছে অথচ ঐতিহাসিক কিছু পিছুটানের খবর আমরা পাই উপন্যাসটিতে।

অনুকম্পার রাজনীতি সামন্ত অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঔপনিবেশিকতা এর সঙ্গে যোগ করে ঘৃণা। অনুকম্পায় দৃশ্যমানভাবে শুভবোধ সক্রিয় থাকে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কর্তৃপক্ষের অহংকে তৃপ্ত করে, আর ঘৃণা তৈরি করে দূরত্ব, এবং উভয় প্রবণতার দ্বারা সমকালীন পুঁজি ও নাগরিক বোধের একটি বিকৃত রূপ প্রকাশ পায়। *রাঙামাটি* উপন্যাসের ঘটনাবৃত্তান্ত আমরা নিরপেক্ষভাবে লেখকের ভাষার কাছাকাছি গিয়ে অনুসরণ করতে পারি : নবকুমারের সহোদরা মনোরমা; 'মনোরমা হচ্ছেন সেই ধাতের মেয়ে যারা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আদৌ দেখতে পারেন না।' 'নগরের অভিজাত সমাজে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি।' উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ললিত মুখুজ্জে অর্থ উপার্জন করেছে, তার সদ্ব্যবহার করেছে, ধর্মেও তার মতি ছিল এবং একই পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়েও 'মনোরমা ও নবকুমারের চিত্তের ধারা বইল বিভিন্ন মুখে।' মনোরমা পড়াশোনার চেয়ে বেড়ানো ও ফ্যাশান-বিলাসকে জীবনের উদ্দেশ্য ধরে নিল এবং তার বিয়েও হল তদনুরূপ বিলাতি আচরণে অভ্যস্ত নবীন ব্যারিস্টার বিজয়েন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে। কিন্তু নবকুমার ছিল মেধাবী ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে বিলাত গেল ডাক্তারি পড়তে এবং পাস করে ফিরে এল কলকাতায়। দেশসুদ্ধ লোক ভাবল, 'চিকিৎসাশাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা এবং মৌলিক গবেষণার জন্য অদূর অবিষ্যতে নোবেল পুরস্কারটা' সে পাবেই। এদিকে সে অবিবাহিত। উপন্যাসে এই ভূমিকার পরেই রেণুকার চিঠি পেল নবকুমার যাকে সে চেনে না অথচ যেতে হবে রাঙামাটি নামক স্থানে, ট্রেনে গেলেও একবেলার পথ এবং সাথে এজন্য চেকও পাঠিয়েছে। ব্যস্ত ডাক্তার, যাবে না যাবে না করেও গেল এবং মুখোমুখি হল রেণুকা

নামের এক বিস্ময়ের। 'রমণী তিনি অনেক দেখেছেন কিন্তু এমনটি আর কখনো দেখেননি। একুশ কি বাইশ তার বয়স।' জানা যায় রেণুকা রোগী নয় অথচ ডেকেছে পরামর্শের জন্য, টাকার ক্ষমতা পরীক্ষার জন্যই নয়, শ্রদ্ধা জানানোও অন্যতম উদ্দেশ্য অথচ নবকুমার চিনতেই পারে না রেণুকাকে, এমনকি রাঙামাটি নামের স্থানটিও তার পরিচিত মনে হয় না। কিন্তু রেণুকার বিধবা পিসি এসে যখন বলে, 'তোমার বাবা যখন কিছুদিনের জন্য বদলি হয়ে এ জেলায় এসেছিলেন, তখন তুমি খুবই ছোট, সেইবার বোধহয় ম্যাট্রিক দিয়েছ। সে অনেকদিনের কথা — তোমার মনে পড়ে না বোধ হয়। আমি রেণুকার পিসিমা।' এরপর তাৎক্ষণিকভাবে সবই মনে পড়ে!

'নবকুমারের পিতা ললিত মুখুজ্জের সঙ্গে হরগোবিন্দের ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব' — স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। হরগোবিন্দের পিতা ছিল ব্যবসায়ী ও জমিদার এবং সে পুত্রকে ব্যবসা সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিলাত থেকে দেশে ফিরতে বলে কিন্তু হরগোবিন্দ ততদিনে অনুধাবন করেছে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান করেন বণিকদের ঘরে আর কৃষি দ্বারা হয় সমষ্টির উন্নতি।' সে কৃষিশিক্ষার জন্য ছুটল রাশিয়া, এরপর জাপান। দেশে ফিরে নিজেদের জমিদারিতে আমেরিকান সার-বীজ ও রাশিয়ার কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগ করল এবং রাঙামাটির রুক্ষ ভূমি সবুজ ফসলে ভরে গেল। এই সাধনার তাত্ত্বিক জায়গাটি দুই বন্ধুর উক্তি থেকে তুলে আনতে পারি আমরা; ললিত বলছে :

> তুমি অসাধ্য সাধন করেছ হরগোবিন্দ? শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের স্বপ্নকে সার্থক করেছ। পল্লীর সমস্ত দলাদলি হিংসা দ্বেষ দূর করে তার মধ্যে এমনি সাম্য আনা, এমনি শ্রী দেওয়া যেতে পারে তা তোমার এ জমিদারি না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।'... 'আমার মনে হয়, তোমার এ অসামান্য সাফল্যের একমাত্র কারণ তোমার প্রভূত অর্থ এবং অসীম প্রতিপত্তি। [অদ্বৈত, ২০০০ : ৫৮৭]

প্রত্যুত্তরে হরগোবিন্দ জানায় :

> অর্থের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সবচেয়ে উচ্চস্থান দেই আমি অন্তরের সদিচ্ছাকে। অন্তরের মধ্যে যদি সত্যিকারের শুভেচ্ছা জন্মে থাকে তাহলে লোকসমাজে প্রতিপত্তি বিস্তৃত হবে আপনা থেকেই এবং অর্থসংগ্রহ করাও বিশেষ সুকঠিন নাও হতে পারে।'... 'আমার যে-সাফল্যটুকু তুমি দেখছ তা আমার অর্ধশতাব্দী সাধনার ফল।' ... 'এখন আমার স্থাপিত কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক থেকে ওরা টাকা ধার নেয়, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। ধার নিলে প্রতি ফসলের সময় কতকটা অংশ আমার কর্মচারী গিয়ে তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসে বিক্রি করে ফেলে, তা থেকেই তাদের ধার শোধ এমনভাবে হয়ে যায় যে, তা তারা জানতেই পারে না। [অদ্বৈত, ২০০০ : ৫৮৭-৫৮৮]

হরগোবিন্দ মনে করে কৃষিব্যবস্থায় প্রয়োগকৃত এই ধারণা 'বোলশেভিজমে'র ভারতীয় সংস্করণ। সে আরো মনে করে দেশের উন্নতি করা যায় তিনভাবে — সরকারের সাহায্যে, জনগণের চেষ্টায় এবং জমিদারের উদারতায়। সে সরকারের বিপক্ষে যেতে চায় না, সে একাধারে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং স্থানীয় আদালতেরও বিচারক; নিজেই জানায়, 'জাতীয়তাবাদীরা হয়তো আমার এই গভর্নমেন্টপ্রীতি দেখে নাক সিটকাতে পারে কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না।' এই আলোচনার মাঝেই আমরা জানতে পারি, নবকুমার ডাক্তারি

পড়তে যাবে এবং হরগোবিন্দ তার ভবিষ্যৎ দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য নবকুমারকে চেয়ে নেয়। এরপর কাহিনিতে প্রেম যুক্ত হওয়ার সুযোগ ঘটল অথচ দুই বন্ধুর মৃত্যু, নবকুমারের বিলাতে শিক্ষাগ্রহণ ও দেশে ফিরে কলকাতায় ব্যস্ততা সেই সুযোগ স্থগিত রাখল।

হরগোবিন্দ কন্যাকে নিজের আদর্শে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে কিন্তু 'কলেজে পড়তে পড়তে রেণুকার কলকাতার সৌখিনসম্প্রদায়ের জাঁকজমকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার ইচ্ছা জন্মেছিল; বাপের ভয়ে পারেনি।' পিতার মৃত্যুর পর সে স্বাধীন, হাতে জমিদারি ও টাকা এবং রাঙামাটি নামের পাড়াগাঁয়ে থাকতেও তার অনিচ্ছা। তাই পূর্বপরিচয় ও প্রতিশ্রুতির ভিন্নতর সুযোগ নিয়ে নবকুমারকে ডেনে আনে সে; উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করে, '... আমি ঠিক করেছি এর পর থেকে কলকাতায় গিয়ে থাকব। টাকার আমার অভাব নেই, আর টাকার অভাব না থাকলে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবের, আমোদ-প্রমোদের অভাব হয় না।' 'আমি কলকাতা গিয়ে বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা বাড়ি নেব। কিন্তু একেবারে নির্বান্ধব হয়ে যাওয়াটা আমি ভালো মনে করি না। প্রথম আলাপটা আপনাকেই করিয়ে দিতে হবে। মনোরমা হয়ত আমাকে ভুলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন, তা হলেই হল। তাহলেই আমি সব ঠিক করে নিতে পারব।' এরপর বলবার কথা সামান্য অথচ দীর্ঘ করেই বলতে হয়েছে গ্রামীণ জনদরদি জমিদার-আশ্রিত সমাজের সঙ্গে নগরের প্রতিতুলনা ও কলকাতার নষ্ট-দুষ্ট সমাজকে দেখানোর জন্য। কলকাতার নাগরিক সমাজে অমিতব্যয়ী ও বিলাসী মনোরমা, সুযোগসন্ধানী হিরণ, ষড়যন্ত্রকারী ভূতপূর্ব জাস্টিসের স্ত্রী জ্ঞানদাদেবী ও লম্পট কবি নামধারী বিজনেশ রায় প্রমুখের খপ্পরে পড়ে বিপর্যস্ত ও হতমান রেণুকাকে শেষপর্যন্ত নবকুমারের বুকেই আশ্রয় নিতে হয়, যে এই নগরে বসবাস করেও নাগরিক সমাজের তীব্র সমালোচক।

আপাতত এই উপন্যাসের কাহিনি বা শিল্পশৈলীর ত্রুটি নিয়ে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে প্রশ্ন জাগে এর কাহিনি, চরিত্রায়ণ ও পরিণামের দ্বারা লেখকের কোন উদ্দেশ্য সফল হল? লেখক চান কল্যাণ, সেই কল্যাণ সাধারণ মানুষের বিশেষত কৃষকের, যেহেতু এরাই ভারতবর্ষের প্রাণ। কাদের দ্বারা সাধিত হবে এই কল্যাণ? শিক্ষিত উদার ভদ্রলোকদের দ্বারাই তো, যারা লেখাপড়া করেছেন বিলাতে! কৃষকের জন্য সার-বীজের মতো কৃষি-উপকরণের ব্যবস্থা করা হবে, দেয়া হবে ঋণ। আর ক্ষমতাও থাকল উপরের দিকে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বে যার চালক ললিতের মতো আইসিএস এবং নিচের দিকে সামন্ত ব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রেরও সুবিধাপ্রাপ্ত হরগোবিন্দ। হরগোবিন্দ একাধারে জমিদার, ব্যবসায়ী এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শাসন ও আইনি ব্যবস্থার কর্তাব্যক্তি। সে এমনকি সমকালীন জাতীয়তাবাদীদের থেকেও আংশিক দূরে, ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষের ব্যক্তিস্তম্ভ। অদ্বৈত সম্ভবত এই আদর্শের দৃষ্টান্ত পেয়েছিলেন কুমিল্লার নরেন্দ্রনাথ দত্তের সমকালীন ভূমিকায়। ব্যবসায়, জমিদারি, শিক্ষাবিস্তার ও কৃষকের কল্যাণ-চিন্তার সমন্বয়ে কর্মীপুরুষের দৃষ্টান্ত তিনি হতেই পারেন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সমগ্র উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কলকাতার ভদ্রলোকেরা যে ব্যবসার দ্বারা অর্থ উপার্জন করেছেন এবং সেই অর্থে জমিদারি ক্রয় করেছেন সে কেবল জনসেবার জন্য? আমাদের স্মরণে থাকা আরেকটি দৃষ্টান্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি ব্যর্থ হননি জমিদারিতে? তিনি কি বলেননি তাঁর কৃষি

উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও নোবেল পুরস্কারের অর্থ মাঠে মারা গেল? এর কারণ নিশ্চয়ই নিহিত আছে কল্যাণ ও কর্তৃত্ববোধের সমন্বয়ের অভাবের ভেতর। শরৎচন্দ্রের পল্লিসমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদের অবক্ষয় ও দলাদলির চিত্রমাত্র নয়, সামন্ত অর্থনীতির অনিবার্য ভাঙনেরও দলিল। তাঁর নব্যনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও সমন্বয় করতে পারেনি অথচ অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাতে মহত্ত্ব আবিষ্কার করতে চেয়েছেন! অনুকম্পা দিয়ে কল্যাণ হয় না, বিশেষত ভূমির মালিকানা নিজের হাতে রেখে কৃষককে প্রায় ভূমিদাসের মতো ব্যবহার করা নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই বিশেষ কৌশল, ব্যাংক-ঋণ সেখানে শোষণের আরেকটি উপাদান বা মাত্রা যোগ করে। বরং হরগোবিন্দ বলশেভিক বিপ্লবোত্তর কৃষিভাবনার ভারতীয় সংস্করণের দ্বারা সামন্ত ব্যবস্থার উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী আগ্রাসনের একটি প্রতিরোধ-পর্ব তৈরি করতে চেয়েছেন। মূলত পুঁজি ও ভূমিব্যবস্থার পারস্পরিক খর্বতার দ্বারা একধরনের নিষ্ক্রিয় বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টা এতে লক্ষণীয়। পুঁজির বিকাশের অনিবার্য নিয়মে তৈরি হয় গণতান্ত্রিক কুহক, তা কমবেশি আঘাত করে সামন্ত বদ্ধতায় এবং উপরি-উপরি উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা চালায়। ভারতবর্ষে আমরা লক্ষ করেছি ব্যবসায় ও জমিদারির চমৎকার মেলবন্ধন এবং এর ফল জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে — কৃষক ও জমিদার বিরোধী পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এক-কাতারে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন করে এবং আশা করে এর দ্বারা পরস্পরের কল্যাণ তথা স্বাধীনতা আসবে। অদ্বৈত নিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক এই চক্রান্তটি জানেন, জামিদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল, একারণেই সম্ভবত উপন্যাসটিতে শুভবোধের কোনো নোঙর নেই — পরিণামে তা ভাসমান ফ্যান্টাসি। অদ্বৈত নিশ্চয় জানেন, ভালো জমিদার কোনো সাধারণীকৃত সত্য নয়, মনোরমা বা রেণুকারা নগরের ভোগবিলাসী জীবন অথবা নবকুমারও তার ব্যক্তিক সম্ভাবনা ছেড়ে কখনো গ্রামে যেতে পারবে না। ভদ্রলোকেরা জন্মেছে উপনিবেশের গর্ভে, নগরে লালিত-পালিত, বিলাসী বায়ু সেবন ব্যতীত তারা বাঁচবে না এবং জনদূরত্বই তাদের পরিণাম।

নিশ্চিতভাবে *রাঙামাটি* উপন্যাসে একটা দ্বৈতাদ্বৈত সংকট ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের – কল্যাণের জন্য ভালো মানুষের অনুসন্ধান। তিনি ভালো মানুষ সন্ধান না করে যদি কার্যকর নীতি সন্ধান করতেন তাতে পথ পাওয়া যেত। তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রটি দেখলেন কিন্তু ব্যাখ্যা করলেন না, এই পিছুটান প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এর একটি প্রতিবিধান আছে *শাদা হওয়া* উপন্যাসে, বিশেষত ভদ্রলোকদের প্রতি আক্রমণের দ্বারা। অবশ্য এবারও তিনি বিকাশমান চরিত্রায়ণের পথে যাননি, বরং চিন্তাকে আরো আগ্রাসী, দৃশ্যমান ও প্রামাণ্য করার জন্য টাইপ চরিত্রের সাহায্য নিয়েছেন। চরিত্র এখানে শ্রেণি-বর্গ তথা দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে '১৯৪২ ইংরাজী সাল।' — এই বাক্যের মাধ্যমে। এই কালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম পর্যায় একদিকে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দলাদলির অনিবার্য ফলরূপে পাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও মাঝামাঝি পর্যায়, যখন ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষভাবে এর খপ্পরে পড়তে থাকে। জাপানের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষার নামে ব্রিটিশ সৈন্য আসতে থাকে কলকাতায়, উপন্যাসে এদের বলা হয়েছে টমি। এর মাঝেই ঔপন্যাসিক বাঙালির তিনটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন : 'দাম-কমে-যাওয়া বিত্তের গৌরব-গর্বে স্ফিত তালুকদার জমিদার, মধ্যবিত্ত নামধেয় বিত্তহীন কেরাণীবর্গ, আর দধিচী চাষী-মজুর শ্রেণী।' প্রথমোক্তরা

বিলাসী, দ্বিতীয়বর্গের মানুষগুলো ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর সহায় এবং তৃতীয় অংশটি শোষিত হওয়ার জন্য মজুদ থাকে। এই উল্লেখের দ্বারা এমন একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হল যার দ্বারা ঔপনিবেশিক শক্তির স্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদীদের দুরভিসন্ধি, সুযোগসন্ধানী ভারতীয় মধ্যবিত্ত ও শোষিত দরিদ্র মানুষের পারস্পরিক মূল্যমান এবং রাজনৈতিক পরিচয় উদ্ঘাটিত হতে পারে। এতে বোঝা যায়, জমিদারতন্ত্রের প্রতি ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মোহগ্রস্ত নন। উপন্যাসের শুরুতেই অনুভূত হয় মূলত বাঙালিবাবুদের রক্ষার জন্যই ব্রিটিশ সৈন্যের আগমন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের বাঙালি গোয়েন্দা গোবিন্দ শর্মা যুদ্ধ ও সৈনিক জীবনের অমানবিক যান্ত্রিকতা নিয়ে চিন্তিত, তাতে এই শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের শ্লেষই ধরা পড়ে। কারণ তার কাজটিও যুদ্ধের অংশ এবং তা ব্রিটিশ শাসনক্ষমতা ও সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতেই সাহায্য করে। তার ভালো-ভালো ভাবনা কূটাভাসের মতো ভেসে আসে কারণ তার উদ্দেশ্য জনসাধারণের উপর নজরদারি করা যদি কেউ কোথাও 'হিজ ম্যাজেস্টিস্ গভর্নমেন্টের ক্ষতি' করতে চায়। রাতের অন্ধকারে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভারতে-আসা ব্রিটিশ সৈন্য টম ও মার্কিন সৈন্য জিলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গোবিন্দ শর্মার। মার্কিনি জিল ছাত্রাবস্থায় ভারতীয় মতাদর্শ বিশেষত বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তারই অধ্যাপকের মাধ্যমে। কিন্তু স্কুলশিক্ষক থেকে সৈনিক হওয়া টমের অন্তরে সক্রিয় থাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অহং :

> আমরা কিন্তু ইন্ডিয়া-ফিন্ডিয়া নিয়ে অত মাথা ঘামাই না। আমাদের আরো দশটা কলোনি আছে, এও তারই একটা। জাদুটাদু অত বুঝি না। একে শাসন করি, এর ভালোমন্দের ভার ঘাড়ে নিয়েছি, কাজেই যখন দেখছি, স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে, তখন চাপ একটু বাড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করি। এর যদি কোনো নিজস্ব প্রভাব থাকে তো তা থাকবে আমাদের পায়ের তলায়, ঘাড়ের উপরে নয়। [অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৪১]

নিজের দেশে যে টম মূর্খ হিসেবে স্কুলের চাকরি হারিয়েছে তার অহংকারের মাত্রা আমরা অনুভব করতে পারি ঔপনিবেশিকতার সূত্রে। টম ও জিল চারপাশে ক্ষমতা ও অহংকারের আবহ তৈরি করে নেয়; ওরা যে সিনেমা দেখতে যায় তাতেও থাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুণকীর্তন। আফ্রিকার প্রকৃতিনিষ্ঠ মানুষকে পদানত করা ও তাদের সম্পদ দখল করার যোগসূত্র মিলিয়ে সিনেমার কাহিনি গড়ে উঠেছে। শাদা চামড়ার ইয়োরোপীয় মানুষদের দখলে যাওয়ার পঁচিশ বছরের মধ্যেই এসব আফ্রিকান চা-বিস্কুট খেতে শেখে, দলবেঁধে গির্জায় যায় উপাসনার জন্য, প্যান্ট-শার্ট পরে এবং অশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলতে পেরে গৌরব বোধ করে। আরো পাঁচ বছর পরে দেখা গেল 'কি একটা বিলাতী উৎসবে মস্তবড় একটা ইউনিয়ন জ্যাকের নিচে দাঁড়িয়ে এরা সমবেত স্বরে গাইছে — গড সেভ আওয়ার গ্রেসাস কিঙ, লঙ লিভ আওয়ার নোবেল কিঙ।' এটি আসলে উপনিবেশ নিয়ে ব্রিটিশদের গর্ব ও উদ্দীপনা মাত্র নয়, প্রোপাগান্ডারও অংশ। সিনেমার বক্তব্য আর টমের মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়ও একসূত্রে গাঁথা। লেখক একে চিহ্নিত করেছেন : 'সে অনুকম্পা। মমত্ব-মিশ্রিত যে সুপ্রিমেসির ভাব, অনুকম্পা তারই নাম।' এই বোধ থেকেই টম যে-কোনো একজন ভারতীয়র সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় — আসলে অনুকম্পা দেখাতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ ঘটে গোয়েন্দা গোবিন্দ শর্মার সঙ্গে।

তিন পক্ষের সাক্ষাৎ ঘটল; এর মধ্যে জিল ও টমের অভিপ্রায় এবং মনোভঙ্গি স্পষ্ট, যদিও জিলের মনোভাবের সঙ্গে টমের দূরত্বও আছে। এই দূরত্বের ভেতর নতুন পুঁজি ও

গণতান্ত্রিক বিকাশের যে সূত্র আছে তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না অদ্বৈত মল্লবর্মণ। দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে বাজার দখলের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, এখানে ব্রিটিশ ও মার্কিনিদের স্বার্থও অভিন্ন নয় এবং একারণেই ভারত সম্পর্কে মার্কিন ও ব্রিটিশ মনোভাব ভিন্ন রকম। মার্কিনিরা ভারতীয় মতাদর্শ নয়, তার পরিসরকে পছন্দ করে যেখানে অনেক মানুষ একটি বৃহৎ বাজারকে ধারণ করে। বর্ণনার কার্যকারণে মনে হয়, অদ্বৈত ব্রিটিশ উপনিবেশের কার্যকারণে ক্ষুব্ধ এবং মার্কিনিদের প্রতি খানিকটা আকৃষ্ট। এমন প্রবণতা আমরা *রাঙামাটি* উপন্যাসেও লক্ষ করেছি — পুঁজির চরিত্র তথা আধিপত্যবোধের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন অদ্বৈত। এমনি আরেক রহস্যের জন্ম দেয় গোয়েন্দা গোবিন্দ শর্মা; তার দ্বারাই ভারতবর্ষীয় আন্দোলনের শক্তি ও অন্তর্ঘাতের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় উপন্যাসে। গোবিন্দের দায়িত্ব সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করছে এমন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নজরদারি, যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তার নজর সবসময় থাকে লেবার লিডারের দিকে কিন্তু এখন সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধে মিত্রশক্তি হওয়ায় কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাচ্ছে না। সে কেরানিদের আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখতে পায় সেখানে একদল আন্দোলন করে, সুবিধাবাদীও থাকে একদল এবং দাবি আদায় হলে দেখা যায় সুবিধাবাদীরাই প্রথম কাতারে। এখানে গোবিন্দ দ্রষ্টামানুষ; সে টমের সঙ্গে শহরতলিতে যায় এবং শহর ও শহরতলির বৈপরীত্যের একটি ব্যাখ্যা মনের অজান্তেই টমের সামনে উপস্থাপন করে : 'অসভ্যকে সভ্য করবার এ সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। ঠিক যেন প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব। — পাশ্চাত্য সভ্য করার নামে ভণ্ডামির মুখোশ পরে চারদিক জীর্ণ পরিপাক করতে করতে এগিয়ে আসছে। প্রাচ্য তার শান্তি হারাচ্ছে আর পাশ্চাত্যও তার ভণ্ডামির মুখোশটা মাঝে মাঝে আলগা করে দেখিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।' এ কথা গোয়েন্দা শর্মার নয়, অনেকটাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের কণ্ঠস্বর এবং তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই কেবল নয় পুঁজির আগ্রাসনকেও সামাজিক নিয়মে বাধা দিতে চায়। তার নিকট স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষী সকলেই কংগ্রেসী হিসেবে পরিচিত; লেবার লিডার, বামপন্থী বা মানবতাবাদীদের প্রতি সে বেশি আক্রমণাত্মক। হয়ত এর দ্বারা ঔপন্যাসিক ভারতীয় রাজনীতির সমকালীন বহুধাবিভক্ত রূপকে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে চান এবং ভদ্রলোকদের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মানসিকতাও এতে প্রকাশ পায়। অথচ গোবিন্দকে দিয়ে ঔপন্যাসিক শেষ পর্যন্ত আকস্মিকভাবে লেবার লিডারকে হত্যা করিয়েছেন এবং লেবার লিডার গোবিন্দকে চিনতে পেরেও কারো কাছে তা প্রকাশ করেনি; মৃত্যুর আগে সে বলে যায়, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, যে মেরেছে সেও নয়।' মৃত্যুর আগে লেবার লিডারের ভাবনা ছিল : 'ফ্যাসিস্তবাদ গলছে। সাম্রাজ্যবাদ গলছে। গলে গলে ক্ষয় হয়ে পড়ছে। — সেদিন আর দূরে নয়।' এই চিন্তা বিপ্লবীর অথচ তাকে দিয়েই কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে পরিণামে — 'একদল চাইছে বিশ্বমানবতার জয়। চাইছে, বিশ্বের পুঁজি ধ্বংস হোক, বিশ্বের লোক শোষণ অনাহার ও দুঃখভোগ থেকে মুক্তিলাভ করুক। এরা বামপন্থী। কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেসের এরা সব ছোট ছোট খুঁটি।' গুরুত্ব পেল কংগ্রেসের রাজনীতি, তিনি গান্ধীর মধ্যেই সাম্যবাদী নেতার প্রতিমূর্তি দেখতে পান; তার মন নিঃসংশয় : 'তার চেয়ে বড়ো সাম্যবাদী কে?' এভাবে উপন্যাসটির রাজনতিক দর্শন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

অবশ্য উপনিবেশ সৃষ্টি ও পরাধীনতাকে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়রূপে উপস্থাপনের দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির একটি পরিচয় দিয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ উপন্যাসটিতে। তিনি অনুভব করেছেন দৃশ্যমান স্বাধীনতার গভীরে পরাধীনতার স্রোত বহমান থাকতে পারে। অবশ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করা টমের সাহায্য নিয়েছেন। এটা যেমন কূটাভাস, তেমনি অদ্বৈতর হতাশার স্থানটিও নির্দেশ করে। টম গরুর গাড়িতে গরুর মাংস বহন করার দৃশ্য ও ভারতীয় গৃহপরিচারকের কুকুরকে 'কুম অন টম, কুম অন' আহ্বানের ভেতর দাসত্বের মানসিকতাকে অবলোকন করে। গরু গাড়ি টানে অভ্যাসের বশে; আর গৃহপরিচারক 'লোকটা মেশিন হয়ে গেছে। গায়ের কালো রঙটুকু ঢাকবার উপায় নেই বললেই চলে। লোকটা এক শ্বেতাঙ্গ রমণীর অধীনে দাসত্ব করছে। তার সাহেবি কথাগুলো বিকৃতভাবে উচ্চারণ করতে শিখেছে। সাহেবি কায়দাগুলি দাসত্বের প্রয়োজনে আয়ত্ত করার চেষ্টার ফলে এখন তারই বিকৃতিটুকু পুরোদস্তর আয়ত্ত করে ফেলেছে। ... সৃষ্টির, সংস্কৃতির ছোঁয়া তাকে ব্যাপ্টাইজ করেছে, তার স্বকীয়ত্বের গোড়াটুকু কেটে দিয়েছে।' ভারতীয়রা যখন ভারতীয়ত্ব হারায় তখন তারা অন্য কারো অধিকারে থাকে এবং তারই ইঙ্গিত বা নির্দেশে কাজ করে। স্বাধীনতা তাই মগজেই তৈরি হয়, এর ব্যত্যয় অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনুভব করেছেন নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে। এরই দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে টমের — টমের বান্ধবী শ্বেতাঙ্গিনী জেন যখন সাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত আন্দোলনকারী যুবকদের মাঝে চলে যায় তখন টমের আশঙ্কা হয় সংঘাতের কিন্তু যখন দেখতে পায় কর্তব্যনিষ্ঠ ইন্ডিয়ান যুবকেরা জেনকে রক্ষা করছে, বরং টমের ধন্যবাদের জবাবে জানায় 'হোয়াইটম্যান! কি দাম আছে তোমার মৌখিক ভালোবাসার... তোমরা ভাবো নারীর মর্যাদা রক্ষা করা মনুষ্যত্ব দেখানো কেবল হোয়াইট ম্যানদের একচেটিয়া কাজ, নন-হোয়াইটদের তোমরা মানুষ বলে ভাবোনি।' — এই সূত্রে টম বুঝে যায় শাদাদের প্রতি এখনও তাদের অন্তরে যথেষ্টই শ্রদ্ধা-ভক্তি বিদ্যমান। এখন কেবল কূটনীতির আশ্রয় নিতে হবে; কেননা সে জানে :

> শ্রদ্ধা আনে বিনতি। বিনতি আনে আনুগত্য। নেতাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠা নিছক সেন্টিমেন্টালিটি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে শ্রদ্ধার অনল তাদের মনের ভিতর ধিকি ধিকি জ্বলছে, সেটাই খাঁটি জিনিস। সেই আগুন কিছুতেই ছাই চাপা থাকবে না। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সাগরের ঢেউও থেমে যায়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হাওয়া থেমে গেলে, তাদের মনের বিপ্লবও শান্ত হয়ে যাবে — কিন্তু যে-শ্রদ্ধা তাদের মনে স্বর্ণরেখায় বসে আছে, তার ধ্বংস নেই। আনুগত্যের কণ্ঠ তারা; মানে এই সমস্ত বিদ্রোহী, যারা আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের Safren gown পরতে সঙ্কোচ বোধ করছে, এগিয়ে দেবেই। আমাদের খালি শক্ত হতে হবে। ভাবধারায় প্লাবনের শক্তি আছে জানি, কিন্তু এ প্লাবন শুধু বিশেষ কোনো দেশের নয় — আমাদের ভাবধারা আছে, একবার সে ভাবধারা প্লাবিয়ে দিয়েছি আমরা, তার স্রোতের আর বিরাম হবে না কোনো কালে। ব্রাভো! [অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৮৪]

ভারতবর্ষীয় বাদামী ভদ্রলোকদের উদ্ভবের কার্যকারণ, ব্যবহার ও বিকাশ বিবেচনা করেই উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যে পৌঁছানো সম্ভব। উপন্যাসটিতে অদ্বৈত ভদ্রলোকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ভারতের কোনো আন্দোলনকারী শক্তি বা সম্ভাবনা অনুভব করেননি, এটি বিস্ময়েরই ব্যাপার। তিনি কেমন করে পারলেন শ্রমিক আন্দোলনকে অস্বীকার এবং তাকে কংগ্রেসী

রাজনীতির অংশভুক্ত করতে? লেবার লিডারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও বিধিবদ্ধ শ্রমিক এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দৃশ্য দেখাতে পারেননি অদ্বৈত। তিনি কেরানির দাবি, বলিষ্ঠতা, ব্রিটিশ-সম্পৃক্তি ও হঠকারিতার ইতিবৃত্তেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলেন। কলকাতার উপর মহলে, সৈনিকদের আগমনে রেস্তোরাঁয়-পানশালায় ও যৌনপল্লিতে সামান্য আলোড়ন তৈরি হয় কিন্তু যেখানে ব্রিটিশভারত পৌঁছায় না, তেমন দরিদ্র মানুষ কিংবা গ্রামাঞ্চল তিনি সামনে আনতে পারেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকনির্দেশ ব্যতীত সময়ের সামগ্রিক সত্য অদ্বৈতর দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে অনুপস্থিত থেকে গেল।

তিন

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯৩৪ সালে যখন কলকাতায় পৌঁছান, তখন পর্যন্ত এটি ভারতবাসী ভদ্রসন্তানের স্বপ্ন, শিল্প-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির কেন্দ্রে প্রবেশ। তিনি সম্ভবত কলকাতা প্রবেশোত্তর অব্যবহিত পুলক, চোখ-ধাঁধানো আকর্ষণের অনেকটাই লাগাম টেনে ধরেছেন অধীত বিদ্যার দ্বারা এবং স্বভাবত প্রান্তিক তো ছিলেনই। তবু প্রথম দুটি উপন্যাস কলকাতার সমকালীন ভদ্রলোকদের ভাবধারার বাইরে যায়নি; প্রথম উপন্যাসটিতে কৃষকদের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হলেও কোনো প্রকৃত গ্রাম বা কৃষকের দেখা মেলেনি। দ্বিতীয় উপন্যাসটি কলকাতায় উপরতলার জীবনের প্রতিনিধিত্বই করে, একবারের জন্য শহরতলিতে যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে কিন্তু তাতে গ্রাম ও শহরের দূরত্বই প্রকাশ পায়। কলকাতার দরিদ্র বা ছিন্নমূল মানুষের কোনো উপস্থিতিই চোখে পড়ে না। দুটো উপন্যাসই তাঁর স্বভাব ও শ্রেণিচরিত্রের বিপরীত প্রান্তকে ধারণ করতে চেয়েছে এবং শৈল্পিক শুদ্ধতা ও আন্তরিকতার প্রশ্নে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে। যে থিসিস তিনি তৈরি করতে চেয়েছেন তা ঐতিহাসিক নিয়মেই ব্যর্থ এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় অল্পদিনের ভেতর। ভালোমানুষ, কল্যাণকামী জমিদার ও কৃষিব্যবস্থার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের কার্যকারণে। এছাড়াও ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক আন্দোলন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক মুক্তি যে আনতে পারবে না তাও অনুভব করেছিলেন তিনি। বিভক্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও সাধারণ মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তৈরি হয় ১৯৪৭ সালে। আসলে ভারতবর্ষের রাজনীতি ও মুক্তির সম্ভাবনা-সফলতা প্রান্তের অর্থনৈতিক সামাজিক মুক্তির ওপর নির্ভর করে, তা অনুভব করেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ আপন অভিজ্ঞতা ও পরিচিত বলয়ে জেগে উঠতে চেয়েছেন। ১৯৪৫-এ পত্রিকায় প্রকাশিত *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের অংশবিশেষে যে শানিত শ্রেণিগত ও সামাজিক আক্রমণ আছে তা পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসের এন্টিথিসিস হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পরবর্তীকালে প্রাথমিক রচনা এবং সংশোধিতরূপে প্রকাশিত উপন্যাস ও তার গতিমুখ তুলনা করে দেখেছেন শান্তনু কায়সার [১৯৮৭ : ৩০-৫০] ও অচিন্ত্য বিশ্বাস [১৯৯৯ : ৭০-৮৮]; তাঁরা দুজনেই স্বীকার করেছেন, এর সংশোধিত রূপটি অধিকতর শিল্পিত ও গভীরতর চেতনাসমৃদ্ধ। এর কারণও লিখিত আছে ইতিহাসের পাতায় কিছুটা, আর কিছুটা মিশে আছে কালের স্রোতে, মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ে। দেশভাগের নিশানা পোঁতা হয়েছিল কলকাতায় বসে, আর দিশা হারিয়েছিল লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ — কেবল গ্রামীণই নয়, দরিদ্র, হতদরিদ্র মানুষ। একটি দরিদ্র

জনগোষ্ঠীর বসবাসের ভূমি ও জীবিকার উৎসজল হারানোর প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক কার্যকারণকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ অভিজ্ঞতা ও নস্টালজিয়ার মেলবন্ধনে রূপময় করে তুলতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। রাজনৈতিক অর্থনীতির শানিত আক্রমণগুলো স্মৃতি-স্বপ্ন ও বৈষ্ণবীয় ভাবাবেগ দিয়ে আপাতভাবে ঢেকে দিয়েছেন কিন্তু তা হারিয়ে যায়নি এবং দুয়ে মিলে তৈরি করেছে ভারতবর্ষীয় সমাজমনস্তত্ত্ব ও প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় ভাবনা। এটি অদ্বৈতর জীবনে জাগরণ, আত্মপরিচয়ের রূপরেখা, কিছুটা আত্মশ্লেষও।

সনাতন ভারতীয় বর্ণবিভক্ত সমাজে কৈবর্তরা সর্বপ্রান্তিক। অথচ উৎপাদন সক্ষমতার দুটি স্তম্ভ কৃষক ও জেলে এই সমাজেরই অন্তর্গত। কেন এই অবহেলা, অচ্ছুৎ বা ব্রাত্য বলে দূরে ঠেলে দেওয়া? এর কারণ নিশ্চিতভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী ক্ষমতাকাঠামোতে নিহিত। আদি সংগ্রহবৃত্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ধারাক্রমে সম্পদ সৃষ্টি ও ক্ষমতার পালাবদলে সমাজে সৃষ্টি হয় জটিল স্তর বিভাজন। ব্যক্তিমানুষের স্বাভাবিক গুণকে একসময় বংশগত স্থায়িত্ব দেবার প্রবণতা চালু হয়, সৃষ্টি হয় বর্ণপ্রথা এবং এর জন্য প্রধানত দায়ী আর্য-আভিজাত্যের মানসিকতা। আর্যদের কাছে যা ছিল অধরা, অপরিচিত ও অপর তা-ই হেয়, নষ্ট, মনুষ্যেতর। তারা মানুষের জন্য শাস্ত্র লিখেছে; এতে কেবল নিজেরাই মানুষ, অপরসত্তা, মনুষ্যেতর বলেই শাস্ত্র-বহির্ভূত। অবশ্য বাস্তব সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রান্তিক জনসমাজকে, তাদের ভাষায় 'মনুষ্যেতর', বিভিন্ন নামে তাদের মনুষ্যসমাজে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। এই অঙ্গীকরণ বা আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে বহু শ্লেষ, বিপর্যাস, বিদ্বেষ, অপমান। সমাজে জনমানুষের অবস্থান-চিহ্ন খোদাই করত ক্ষমতাবানেরা, সাধারণকে এই পরিচয়ই প্রত্যক্ষে, অন্তরে ধারণ করতে হত এবং সম্পর্কের স্তর ও মান নির্ধারণের দ্বারা জন্মগতিকেও নির্ধারিত করে দেবার চেষ্টা চলেছে এই প্রক্রিয়ায়। আর্য মানসিকতার পৃষ্ঠপোষণা প্রাপ্ত সবগুলো ধর্মই উত্তর ভারতের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ও চালিত; তাদের নিকট প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। আবার ক্ষমতার কার্যকারণে কায়িক শ্রমকে স্থান দিয়েছে নিম্নস্তরে। প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন উৎস থেকে সহজেই জানা যায়, পূর্বপ্রান্তের জনগোষ্ঠীকে ভালো চোখে দেখেনি ব্রাহ্মণ্যবাদী কেন্দ্র। অথচ নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর এই বাংলায় প্রবাদ তৈরি হয়েছে 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। রাক্ষস বা নাগদের কাহিনি আমাদের জানা আছে; ব্রাহ্মণ্যবাদী ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ পেয়েছে পরাশর ঋষি কর্তৃক জেলেকন্যা মৎস্যগন্ধার সম্ভ্রমহানির ঘটনায় ও তাকে পরিণামে সত্যবতী বা যোজনগন্ধায় পরিণত করার মাধ্যমে [সুধীরচন্দ্র, ১৪১২ : ৫৩০-৫৩১]। ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণীয় সমাজ মাছের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছে, এর কারণ থাকতে পারে পশুপালক আর্য-মনস্তত্ত্বে এবং প্রাপ্যতার বাস্তবতায়। শুদ্ধ আহার হিসেবে নিরামিষকে গ্রহণ করার উত্তর ভারতীয় ও দাক্ষিণাত্যের প্রবণতা কাজ করেনি প্রান্তের দিকে বিশেষত পূর্ববঙ্গে। এখানে আর্য-আধিপত্য তুলনামূলক কম, নদীবহুল দেশ হওয়ায় মাছের প্রাচুর্যও আছে; এজন্য বাঙালি স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট বাঙালির মাছ খাওয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য এতে স্পষ্ট বাংলার বাইরে বাঙালির মাছের প্রতি আগ্রহকে ঘৃণার চোখে দেখা হত [নীহাররঞ্জন, ১৪১৬ : ১৫০]। এই কার্যকারণে মৎস্যশিকারী কৈবর্তরাও সমাজে প্রান্তিক। বিষ্ণুপুরাণে শ্রমজীবী কৈবর্তরা ব্রাহ্মণ্য সমাজ-বহির্ভূত সম্প্রদায়; মনুস্মৃতিতে নিষাদ-পিতা

ও আয়োগব মাতার সন্তানকে বলা হয়েছে কৈবর্ত, এদের উপজীবিকা মাঝিগিরি; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৈবর্তদের বলা হয়েছে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রাহ্মণবর্ণ বাদ দিয়ে ৪১টি জাতির উল্লেখ করা হয়েছে; এতে ধীবর ও জালিক মধ্যম-সংকর এবং মল্ল অন্ত্যজ-সংকরভুক্ত [হরিশংকর, ২০০৮ : ৬]। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় মল্ল'রা কেবল শূদ্রই নয়, আরো প্রান্তিক। মনু-কথিত যে ব্রাত্য জনজাতি, তাদেরই অন্যতম দৃষ্টান্ত আজকের মল্ল'রা। ব্রাত্য অভিধা অবনমনসূচক; যারা বৈদিক আবহচ্যুত তারাই ব্রাত্য, কৈবর্তরা এর অন্তর্ভুক্ত। কৈবর্তরা হয় শিব নয় কৃষ্ণ অনুসারী, তাই তারা আর্য ভাবধারায় অবনমিত জনগোষ্ঠী ও ব্রাত্য। কৈবর্তরা সম্ভবত আর্যপূর্ব কোনো কোম বা গোষ্ঠী, যারা পরবর্তীকালে আর্য সমাজের নিচের দিকে স্থান পেয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতেও রাঢ় অঞ্চলের ভবদেব ভট্ট কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করেছেন অন্ত্যজ হিসেবে সর্বনিম্নে। রাঢ় অঞ্চলে মল্ল নামের স্বতন্ত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; এদের সঙ্গে জৈনদের বিশেষ গোষ্ঠী মলধারীর সংমিশ্রণ ঘটতে পারে [মেসবাহ, ২০০৭ : XXVI]। পূর্ববাংলায় বিশেষত ত্রিপুরা অঞ্চলে মালো বা জেলেদের বলা হয় 'গাবর' বা 'গাবুর'। তুচ্ছার্থে প্রয়োগ করা গাবর শব্দের দ্বারা অসভ্য ও মূর্খতা বোঝায়। *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার* 'শ্যাম রায়ের পালা'য় বলা হয়েছে 'সহজে গাবরিয়া জাতি অতি কদাচন' [দীনেশচন্দ্র, ২০০৯ : ১০২৩] অর্থাৎ ব্রাত্য তো বটেই, কদাকারও। আরো আক্রমণাত্মক-ভাবে বলা হয়েছে 'ধাঙ্গরা গাবরিয়া রাজা জাতি তাহাতে বর্ব্বর' অর্থাৎ বর্বর জাতি এবং পেশায় ধাঙ্গর। এতে জৈন মলধারী গোষ্ঠীর সম্পর্ক হারিয়ে গিয়ে সত্যিকার মল পরিষ্কারক পেশার উল্লেখ পাওয়া গেল। অথচ পাল আমলে এই কৈবর্তরাই বিদ্রোহী হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা গঠন করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ক্ষমতার দাপট ও পালাবদলে অনেক জনগোষ্ঠীর এমন পরিচয় ও পরিণাম ঘটেছে ঐতিহাসিক বিভিন্ন পর্বে। এমনই লক্ষ করি আমরা আজকের পালদের, সুবর্ণবণিকদের মধ্যে; এমনই হয়ত পালাবদল ঘটেছে বর্মণ, দেববর্মা, মল্লবর্মণ ও দেববর্মণদের ক্ষেত্রে। রাঢ়ে মল্লরা যেমন অন্ত্যজ তেমনি তাদের রাজবংশেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে সমতট অঞ্চলে খড়্গ বংশ রাজত্ব করত। তারা নিজেদের দেবখড়্গ এবং কালের ও সম্পর্কের গতিধর্মে দেববর্মা হিসেবে পরিচয় দিয়েছে একপর্যায়ে। ত্রিপুরার পাহাড়বাসীদের উপাধি এখনও দেববর্মা বা দেববর্মণ লক্ষ করা যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্মণরাজবংশ রাজত্ব করেছে সমতটে [রমেশচন্দ্র, ১৯৮১ : ৫১]। ভাটি অঞ্চলে মল্লরা এখনও বীর, কুস্তি লড়ুইয়ে এবং এরই পরিবর্তিত রূপ 'মাল'।

শত শত বছরের ইতিহাসে মল্ল বা বর্মণেরা ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা অঞ্চলে সম্ভবত বহু পালাবদলের ভেতর দিয়ে গেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটি সেই সমাজবদলের ইতিহাসের স্মৃতি ও সমকালকে ধারণ করে আছে। কালের গতিপথে আরেকটি পালাবদলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মল্লবর্মণেরা গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার যে পরিচয় লাভ করে তার বর্ণনা আছে উপন্যাসটিতে। ভারতবর্ষীয় গ্রামগুলো ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি বহন করছে; আদিতে ব্রাহ্মণ কুলপতি, তার অধীনস্থ পরিবার-পরিজন, শিষ্য-সেবক, সহকারী, বিভিন্ন কর্মজীবী ও দাসদাসীদের সামগ্রিকভাবে গ্রাম বলা হত। এতে তৈরি হত ব্রাহ্মণ্য কেন্দ্র বা পরিমণ্ডল এবং ব্রাহ্মণ ইচ্ছে করলে

গ্রামসহ স্থানান্তরে যেতে পারত বা প্রয়োজনমতো চলে যেত [সুকুমার, ১৯৭০ : ১২-১৩]। কিন্তু কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকের ভূমি ও কৃষিনির্ভর কর্মকাণ্ডের স্থায়ীত্বের কারণে এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনে 'গ্রাম' শব্দটির দ্বারা কৃষক, বিভিন্ন কারিগর ও পেশাজীবীদের নিয়ে কৃষিনির্ভর একটি ভূমিব্যবস্থা ও অবস্থানকে বোঝায়। এই পরিবর্তনে কৃষকের সঙ্গে জেলেরাও যুক্ত হয় অর্থনৈতিক নিয়মে। অবশ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কৈবর্তদের অবস্থান কেন্দ্রে হলেও বর্ণবৈষম্যে ছিল প্রায় সর্বপ্রান্তিক। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে কালকেতুর নগর প্রতিষ্ঠার কালে প্রায় সবার শেষে আসে কৈবর্তরা; এতে বলা হয়েছে 'মৎস্য বেচে চষে চাষ/ কৈবর্ত ধীবর দাস' [মুকুন্দরাম, ২০০৭ : ৮২]। অরণ্যচারী কালকেতুর রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় বাংলার গ্রামীণ ব্যবস্থাকেই স্মরণে রেখেছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এমনই চাষি ও জেলের জীবনাচরণকে অবলম্বন করেছেন *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে। অবশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ যখন বাজার অর্থনীতির মুখোমুখি দাঁড়ায় তা অনেকাংশে নদীর স্রোতের মুখে তীর ভাঙার চিত্রকল্প তৈরি করে; স্রোতের তোড়ে দুর্বল পাড় ভেঙে পড়ে, অন্য পাড়ে জমা হয় পলি [গৌতম, ১৯৯৯ : ৩২]। জীবন, সমাজের স্থিতি কালের গতি তথা রাজনৈতিক-অর্থনীতির ওপরেই নির্ভরশীল; প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সমাজে এই অর্থনৈতিক পালাবদল ঘটেছে এবং নতুন নতুন রাজনৈতিক ঢেউ এসেও আঘাত করেছে। এসব উপাদান সমাজ তার হাড়ে-মজ্জায়, কখনো কখনো রক্তসৃষ্টির উপাদানরূপেও ধারণ করে থাকে। কৃষির দেবতা শিব ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ক্ষমতাকেন্দ্রের বাইরে, দক্ষযজ্ঞের ঘটনায় তার প্রমাণও পাওয়া যায়। দরিদ্র কৃষক ও আত্মভোলা শ্মশানচারী হিসেবে শিব আর্যেতর জনগোষ্ঠীর মধ্যে কল্যাণকারী শক্তির দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অপরদিকে মুসলিম শাসনকালে পূর্ববঙ্গে বিশেষভাবে কৃষকসমাজে একেশ্বরবাদী ইসলামের জীবনাদর্শ আকর্ষণ তৈরি করে। এর পরে চৈতন্যের আবির্ভাবের পর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই বিশেষভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শক্তিসাধনার কার্যকারণে শিব একসময় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ববান বর্গের জলুসের বন্ধন ও অহংকারের প্রতিরূপে আবদ্ধ হয়, সাধারণ কৃষকের দেবতা চলে যায় জমিদারের নিয়ন্ত্রণে এবং ক্ষুদ্র কৃষকসহ আরো প্রান্তের দিকে ব্রাত্যজনের শক্তি সাধনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় মহাকালের মুক্তিপ্রতিমা 'কালী'। এ সবকিছুই রাজনৈতিক-অর্থনীতির দ্বারা নির্ধারিত আর্কিটাইপ এবং তাও একসময় পরবর্তী অর্থনৈতিক কার্যকারণের দ্বারা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণ সমাজদেহের কাঠামোটিকে নরনারীর আবেগ, ঘরসংসার পরিবার ও উৎসবে আনন্দে ঢেকে দিয়েছেন কিন্তু কালের গতিকে তিনি রুদ্ধ করতে চাননি। এর কাঠামোতে আছে শিবময় কল্যাণসাধনা, রাধার কৃষ্ণকে খুঁজে ফেরার রূপকার্থ, কালীর শক্তিসংগ্রহ, মনসার কৃপাদৃষ্টি লাভের আকুতি কিন্তু জীবিকার সংগ্রাম কাউকে রেহাই দেয় না।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে চারটি পর্বের প্রতিটিতে দুটি করে মোট আটটি অধ্যায় আছে। উপন্যাসে প্রধানত দুটি জীবনধারা বহমান; প্রথমত মালো, তারা তিতাসের জলনির্ভর; দ্বিতীয়ত কৃষক, তিতাসপাড়ের ভূমি কর্ষণজীবী। মালোরা সনাতন বৈষ্ণব, কৃষকেরা মুসলমান — এতে ইতিহাসেরও আছে সামান্য দূরস্মৃতি। নদী ও তার প্রবাহকে জীবনগতির রূপকার্থে ব্যবহার করে তীরবর্তী জেলে ও কৃষকের আর্থসামাজিক বাস্তবতা ও

বিবর্তনকে তুলে এনেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। উপন্যাসের মূল সুর মানবলীলা; গতিই এর মূলকথা, এতে ভাঙাগড়া আছে — এক তীর ভেঙে অন্য তীরে জমা হয় পলি। আর যদি নদীগর্ভে জেগে ওঠে চর, সেও হয় গতিচেতনার প্রতিবন্ধকতা। কিছু অংশ পত্রিকায় প্রকাশ ও সংশোধনের পর পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশের মাঝে অদ্বৈত মল্লবর্মণের চেতনাগত পরিবর্তনের ছাপ রয়েছে উপন্যাসটিতে। এজন্যই কোনো কোনো সমালোচক তার সাংগঠনিক রূপ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত; '... উপন্যাসটির গঠন নির্দোষ নয়। উহার ঘটনা বিন্যাস এককেন্দ্রিক নহে, বহু স্তর বিভক্ত; উহার প্রধান চরিত্রসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত' [শ্রীকুমার, ১৯৮৪ : ৭৬৭]; 'বইখানি যেন নদীর পাঁচালী হয়ে উঠেছে' [সরোজ, ২০০৩ : ৩২২]। অথচ অদ্বৈত মল্লবর্মণ গ্রন্থটি সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন এমনই আমরা জানতে পারি :

> প্রথম যখন পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম — "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' আর কি তোমার বই মানুষ নেবে"? বলেছিলেন অদ্বৈত : "সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা — রোমান্টিক। আর আমি জাউলার পোলা" আর কিছু বলেন নি। পরিচয়ের এই প্রত্যক্ষতাই ছিল তাঁর গৌরবের ভিত। [সুবোধ, ১৯৯৯ : ৯]

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনদর্শন। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের আখ্যায়িকার সঙ্গে মিল রেখেই যেন তিনি কাহিনিকে অষ্টাধিক সর্গে/পর্বে বিভক্ত করেননি। মহাকাব্য নয়, আখ্যানের এক শ্লেষ তৈরি করেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ যাতে উদ্ধার বা উত্তরণের সঙ্গে কাহিনিকে যুক্ত করা যায়নি। তবু কালের গতি, মানুষ, প্রকৃতি ও স্থানিক পরিবর্তন-বিবর্তন নিয়ে সম্পৃক্তি ও অসম্পৃক্তির যে একটা দোলাচল তৈরি হয়, যাকে আমরা নস্টালজিয়া বলি, তারও গোষ্ঠীগত প্রকাশ আছে কাহিনিতে। এই সঙ্করতা ভারতীয় জীবনাদর্শজাত বলেই শিল্পচেতনায়ও এর অনিবার্য প্রভাব আছে। উপন্যাসটিকে অনুসরণ করলেই আমরা এই সত্য অনুভব করতে পারব।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই তিতাস নামের নদীটিকে দার্শনিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার প্রেক্ষাপটে বিবেচনার সূচনা করেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিতাস এমন একটি নদী যার আগ্রাসী রূপ নেই অথচ যে প্রাণদায়ী রূপে সর্বদা জনপদ ঘিরে বহমান। জনপদের জীবন অর্থে সমাজগঠন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি এই নদীর উপরই নির্ভরশীল। নদী, জল ও জেলের জীবন নিয়েই প্রাথমিক সূত্র এবং তার তুলনামূলক পরিচয়। তিতাসের তেরো মাইল দূরে বিজয় নদী ও তার তীরবর্তী জীবনধারা বর্ণনায় অদ্বৈত তিতাসপাড়ের মানুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেন :

> সে সব গাঁয়ে তারা দেখিয়াছে, চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয়। একদিক দিয়া জল শুখায় আর একদিক দিয়া মাছেরা দমবন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাক জাগাইয়া হাঁপায়। মাছেদের মত জেলেদেরও তখন দম বন্ধ হইতে থাকে। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ১৬]

প্রবাস-করা জেলেরা টাকার জোরে বেঁচে যায়; তা না হলে দুর্বিপাক, তারা বর্ষার জন্য অপেক্ষা করে, যেমন গৌরাঙ্গ বা নিত্যানন্দ। এর বিপরীত প্রান্তে আছে নয়ানপুরের বোধাইর মতো ধনী জেলে। সে 'বড় বড় দীঘি ইজারা নিয়া মাছের পোনা ফেলে। মাছ বাড়িতে থাকে, আর তারা তিন বাপ বেটায় লোকজন লইয়া জাল ফেলে, মাছ তোলে, মাছ

চালান দেয়। এ কাজে বোধাই অনেক লোকজন খাটায়। নদীতে জল না থাকিলে, মালোরা যখন দুই চোখে অন্ধকার দেখে তারা যায় বোধাইর বাড়িতে।' প্রয়োজন, প্রকৃতি ও অর্থনীতির বিবর্তন-সূত্রটি সংক্ষেপে জানিয়ে দিচ্ছেন অদ্বৈত। কেবল প্রকৃতিনির্ভর সংগ্রহবৃত্তির যে আদিম অর্থনীতি তার দ্বারা কালের গতির হাল ধরতে পারেনি মালোরা কিন্তু সেখানে পরিকল্পিত চাষাবাদের দ্বারা কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাচ্ছে বোধাই। অর্থনীতির গতিসূত্রটি জানা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে মালোরা তা গ্রহণ করেনি এবং একাংশ পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। বিজয় নদীর এই দৃশ্য দেখেও সাবধান হয়নি তিতাসের মালোরা, বরং ভেবেছে 'বিজ্‌নার পারের মালো গুষ্টি বড় অভাগা রে ভাই, বড় অভাগা।'

নদীপারের মানুষের সুখ-দুঃখ ও প্রকৃতি বর্ণনার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মেলবন্ধনকে রূপ দান করেন অদ্বৈত। প্রকৃতিতে কোনো এক শিল্পীর হাতের ছোঁয়া যেমন তিনি লাভ করেন, তেমনি জানান 'নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে। কালও বহিয়া চলে।' বহমান কালের শেষ নেই, এই প্রত্যয় জীবনচেতনায় ধারণ করেই অদ্বৈত মানুষকে রূপ দেন এবং এ কারণেই এপিক-চেতনার আবহ তৈরি হয় উপন্যাসের কাঠামোতে। কেননা ইতিহাস বা ঐতিহ্য তার পালাবদলের চিহ্ন মানুষের কর্মকাণ্ড তথা অর্থনীতি বা সংস্কৃতিকে রেখে যায়, বহমান রাখে। অদ্বৈত জানেন 'খাঁটি রক্তমাংসের মানুষের মানবিকতা আর অমানবিকতার অনেক চিত্র'র ভেতর দিয়েই রচিত হয় যথার্থ ইতিহাস এবং একেই বলেছেন 'সত্যের মত গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ।' এর ফলে উপন্যাসটিতে বিশেষ অঞ্চল বা ব্যক্তিবিশেষের নস্টালজিয়ার প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়নি। অদ্বৈত'র অভিজ্ঞতা ও আর্থ-রাজনৈতিক বীক্ষার কারণে মালোদের পাশেই প্রতিরূপের মতো এসেছে কৃষকেরা, যদিও সম্পন্ন কৃষক জোবেদ আলি এবং দুজন মুনিষ করমালী ও বন্দে আলী এক বর্গের নয়। শ্রম বিক্রি-করা মানুষগুলো জীবনের সাধারণ কিছু মূল্য থেকে বঞ্চিত – মনিব যখন শীতের রাতে নৌকায় নদী পার হয়, মুনিষেরা পার হয় গরুসহ সাঁতার কেটে; জমির কাজ শেষে প্রভুর ঘরের কাজও শেষ করতে হয়। তবু তারা খেতে পায়, তাদের পরিবারের লোকজন হয়ত তাও পায় না; বন্দে আলি যেমন বলে : 'ভাই করমালী নিজে ত খাইলাম ঝাগুর মাছের ঝোল। আমার ঘরের মানুষের একমুঠ শাক-ভাত আজ জুটল নি, কি জানি?' উপন্যাসে এই ক্ষুধা, সম্পর্ক ও জীবনের মোহ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেন অদ্বৈত।

সংস্কৃতি যৌথজীবনের রক্তপ্রবাহের মতো, তা অর্থনীতির ভিত্তিতে দাঁড়ায় এবং সংস্কৃতির ভেতরে প্রোথিত থাকে ব্যক্তিত্বের আর্কিটাইপ। দলিত জনসমাজের ব্রত-পালাপার্বণ ব্রাহ্মণ্য ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক বলয় থেকে দূরবর্তী তো বটেই, আত্মসন্ধান ও ঐক্যেরও উৎস। অদ্বৈত এই ধারণার প্রকাশে চরিত্রকে নির্বিচারে কেন্দ্রে স্থান দেননি, চরিত্রকে ডুবিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক উৎসবে। যৌথতা এখানে প্রধান চরিত্র এবং সংস্কৃতি এখানে নির্ণায়ক শক্তি — ক্ষমতা, উৎপাদন, অর্থনীতি, সম্ভাবনা ও সংকটের নির্দেশক। শিবকে কৃষকের কর্ম ও ভাঙা ঘর থেকে জমিদার সরিয়ে নিল কিন্তু তাদের প্রয়োজন ও অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারল না, এজন্যই এখনও লিঙ্গ ও লাঙ্গলের যোগসূত্রে যৌনতার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকল অথচ তা সীমাবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদের রীতি মেনেই।

সম্ভবত একারণেই মালোর মেয়েরা শিব নয়, মাঘমণ্ডলের ব্রত পালন করে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে পাই, 'উৎসব' — যা সুখ প্রসব করে। সামাজিক নিয়মে মিখাইল বাখতিন-কথিত কার্নিভাল তত্ত্বের সঙ্গে এইসব উৎসবের মিল আছে। কারণ এগুলো ক্ষমতাবানদের উৎসবের বা জীবনপদ্ধতির আত্মনিষ্ঠ অনুকরণ করে। আবার এগুলো ক্ষমতার বৈষম্যের ভেতর দিয়ে তৈরি করে কেন্দ্রীয় ভাবনার ব্যঙ্গাত্মক রূপ। যে কোনো ব্রতের মতোই মাঘমণ্ডলও ঢিলেঢালা আচরণ ও উৎসবে পরিণত হয়, কাঠিন্য-গাম্ভীর্য বা আভিজাত্যের ছোঁয়া এতে থাকেই না। কলার ডগায় বানানো ভেলা রঙিন কাগজে মুড়ে খেলার সামিল প্রক্রিয়ায় নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার পর বালকের হাতের দাপাদাপিতে বিনষ্ট বা ডুবে যাওয়ার মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত। ছেলেদের হাতে ধরার এই ক্রিয়ায় নারীজীবনের আশ্রয়ের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়, অনেকখানি মিলে যায় শিবপূজার সঙ্গে অথচ বয়োজ্যেষ্ঠরা এসময় গায় কৃষ্ণবিরহে রাধার আকুতির কথা। এই যৌথ ঐতিহ্যের সমন্বয়ে কাম ও প্রেমের স্তর-বিভাজন আছে; শৈব প্রত্যক্ষ কামের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় প্রেমের পার্থক্য সূক্ষ্ম হলেও আছে। এর একটি দৃষ্টান্ত আছে পরবর্তীকালে, কিশোর যখন বেদেনির ঠাণ্ডা স্তনের স্পর্শজাত কামকে অস্বীকার করে অনন্তর মায়ের প্রাথমিক পরিচয় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এই সমন্বয় প্রান্তিক মানুষের মনস্তত্ত্বের পরিচয় দেয় — সংস্কৃতিই নয়, অর্থনীতিও। এর নাম হতে পারে সংযমের সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। আমৃত্যু পাওয়ার আকুতি নিয়েই রাধাবিনয় ও প্রণতি ঘোষিত হয় কিন্তু কৃষ্ণের মানবলীলা যেমন প্রবাসী কার্যক্রম তেমনি প্রেমের চরম পর্যায়েও থাকে ক্রূর এক প্রবাস অর্থাৎ বিরহ। প্রবাসের কয়েক স্তরের প্রত্নস্মৃতি উপন্যাসে ক্রম-আবর্তিত হয়। যে চৌয়ারি কিশোর পেলে বাসন্তী খুশি হত তা পেল সুবল, আমরা যেন মনে রাখি বাসনাও সম্পদের ধারণাজাত — এই ইঙ্গিতের পর সামান্য একটু অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা এবং মাছ ধরার প্রবাস যাত্রায় সুবল হল কিশোরের নৌকার সঙ্গী। ক্ষমতার প্রলোভন কৃষ্ণকে রাধার হাত-ছাড়া করে, আর মালোরা প্রবাসে যায় ক্ষুধার তাড়নায় — এই কারণেও তো কারো হাত-ছাড়া হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। মানুষের মনে, সমাজেও স্থিতির তাগিদ থাকে, সুবলের মার যেমন ছিল সুখময় জীবন-সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা : 'এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ।' গগন মালোর এ কথা স্মরণ থাকলেও উপায় থাকে না।

উপায়ের সন্ধান দেয় প্রবাস; উত্তরে প্রবাসে যাত্রা করে কিশোর, সুবল ও তিলক। পেছনে পড়ে রইল ক্ষুধার্ত সংসার এবং কিশোরের কাছে আপাত অস্পষ্ট এক প্রেম। অথচ নদীতীরে এগারো বছরের বাসন্তীর উলুধ্বনিময় উপস্থিতি নীরব নয়। তিতাস যেখানে মেঘনাতে মিশেছে, সেখানে বড় নদী, বড় জীবন; ঘাটের নাম ভৈরব, পাশেই রেললাইন এবং সেই সূত্রে অন্যরকম এক জীবনের বার্তা বহন করে আনে সুবল — 'ভৈরবের মালোরা কি কাণ্ড করে জান নি? তারা জামা-জুতা ভাড়া কইরা রেলকোম্পানির বাবুরার বাসার কাছ দিয়া বেড়ায়, আর বাবুরাও মালোপাড়ায় বইআ তামুক টানে আর কয়, পোলাপান ইস্কুলে দেও — শিক্ষিৎ হও, শিক্ষিৎ হও।' কিন্তু বহু-দেখা তিলকের বুড়ো চোখে এসব কি পাত্তা

পায়! সে ক্ষেপে যায়, কারণ শিক্ষিত হলেও ভদ্রলোকেরা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করবে না অর্থাৎ বর্ণ বা বর্গীয় বৈষম্য থাকবেই; আসলে তাদের উদ্দেশ্য খারাপ, 'মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া-লোকের উপর।' এভাবে ঘাটে নয়, তীরেও ভিড়ে না মালোর নৌকা; ভেসে যায় উজানিনগরের খলার দিকে। তবে মালোর মন মালো চিনে, ঠিকই নয়াকান্দার নয়াবসতির সুখের তথ্য জেনে যায় — 'এখানে জমিদার নাই। বেশ শান্তিতে আছে।' এই শান্তি অর্থনীতির এবং এর প্রকাশ ঘটে পরিবারে। যেখানে উদয়াস্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই সেখানে একটি সুখি পরিবারের কল্পনা করে কিশোর — 'যে-পরিবারে একটি নারী আছে একটি নন্দিনী আছে, আর পুরুষকে সারারাত নদীতে পড়িয়া থাকিতে হয় না।' অর্থাৎ প্রবাস নেই, উপবাস নেই, সেখানেই শান্তি, সেখানেই প্রেম। এই মিলনের কথাই তো বলে বৈষ্ণবের সাংস্কৃতিক অর্থনীতি! তবে শিবময় কর্তৃত্বের কথা তারা ভুলতে পারে না; বিরোধে বা সমন্বয়ে তারা পাশাপাশি থাকে তবু পরিচয় জেনে নিতে হয়; নয়াকান্দার সাধুর জিজ্ঞাসা : 'আমি কই, তোমরা বিরাজ কর বৃন্দাবনে না কৈলাসে — তোমরা কৃষ্ণমন্ত্রী না শিবমন্ত্রী।' শিবকে কৈলাসে ঠেলে পাঠাল কারা? যে ছিল কালিঝুলিধূলি মাখা, শ্মশানচারী, ভিক্ষুকবেশে কাছের জন তাকে ভক্তি থেকে পূজায় সরিয়ে নিল কারা? এর উত্তর প্রত্যক্ষভাবে দেননি অদ্বৈত, কেবল মিলন-প্রত্যাশায় রাধাবেদনার ভার নিয়ে কৃষ্ণসন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন। মানুষের অন্তর যখন নিত্য বৃন্দাবন, তার সন্ধানই করেছেন; এই মানুষের মেলামেশা নিজের ভেতর, পথে-পথে। এই ভাবাদর্শের সূচনা হল কিশোরের দ্বারা, অথচ সাধুসঙ্গে রাত্রিকালীন গীতধারায় রাধার বেদনা তো মানুষের অপ্রাপ্তির প্রত্নস্মৃতি মাত্র নয়, বাস্তব পরিমণ্ডল — তাদের প্রবাসযাত্রার কার্যকারণ। এজন্য ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যৌথতায় উৎসবের অঙ্গীকার শেষ পর্যন্ত কোথায় ব্যঙ্গ করবার উৎসাহও হারিয়ে ফেলে এবং আপন দুঃখে জলের সঙ্গে জলেরই কানাকানি শোনা যায়।

কিশোরদল পৌঁছায় উজানিনগর, যদিও তা উত্তরে তবু জীবনের ভাটি অতিক্রমের চিহ্ন। তারা পৌঁছায় শুকদেবপুর বাঁশিরাম মোড়লের বাড়ি। মোড়লের চারভিটার খড়ের ঘর সংস্কারের অভাবে জীর্ণ অথচ সে প্রত্যক্ষে এক বাক্স রুপার টাকা গোনে। শরীরে অজস্র শক্তির প্রতিমূর্তি হিসাবে রূপ নেয় এই মোড়ল; শক্তি, শারীরিক গঠন, সেবায়, কল্যাণের ভাবনায়, রক্ষায় এবং আত্মভোলা পারিবারিক চিহ্নে এই মানুষকে কখনো মনে হয় রাক্ষস, কখনো ভীম এবং অবশেষে শিব। কিশোর বলেছিল, 'তোমার দিকে চাইয়া আমার শিবঠাকুরের কথা মনে পড়ে।' কিন্তু মোড়ল বলে, 'আমরা ত শিবমন্ত্রী না, আমরা কিষ্ণমন্ত্রী।' তার প্রশ্ন ছিল 'তোমরা কোন দেশের দেশী?' বৃন্দাবনের বলেই ঐক্য হল, এখানেই মানুষের অন্তরের বৈভব এবং তার প্রকাশ হল রাত্রিকালীন গানের আসরে। কিশোর নয়াকান্দায় দেখেছিল জীবিকার স্বাচ্ছন্দ্যে পারিবারিক সুখের নমুনা, সুকদেবপুরে দেখল স্বাস্থ্যবান মানুষ। এর অর্থনৈতিক কারণটি অনুধাবন করতে পারলেও আপন জীবনের প্রেক্ষাপটে উপায়হীনভাবে দৃষ্টান্তটি উপস্থাপিত হয় :

> এখানে ঘরেঘরে জাল যেমন আছে তেমনি হালও আছে। প্রত্যেক বাড়িতেই একপাশে জালের সরঞ্জাম, আর একপাশে হালের সরঞ্জাম। ... অযত্নরক্ষিত ঘর দুখানার একখানাতে যেমন দুই এক পুরুষের পুরানো জালের পুঁটলি পুরাতন পঞ্জিকার মত জমিয়া উঠিয়াছে, তেমনি

> অন্যখানাতে বিভিন্ন বয়সের গরুবাছুরের ঘাসে ফেনে গোবরে থম্‌থম্‌ করিতেছে। ইহাদের জীবনদেবতা আকাশের আদমসুরতের মত দুই দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া রাখিয়াছে। একদিকে নদী মাছে ভরভর আরেকদিকে মাঠ ফসলে হাসি-হাসি। কোনোদিন কোন অদৃশ্য শয়তান যদি ইহাদের জালের গিঁটগুলি খুলিয়া দেয়, নৌকার লোহার বাঁধগুলি আলগা করিয়া ফেলে, আর নদীর জল শুষিয়া নেয়, ইহারা মরিবে না। ক্ষেতে শস্য ফলাইবে। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ৫৬]

দুটি অর্থনৈতিক গতিধারা ও তাদের যোগফল এই বর্ণনায় আছে। এতে রাজনীতিও আছে। কৃষির দেবতা শিব, তাকে কৃষকের ঘরে প্রতিষ্ঠার একটি ইঙ্গিত প্রদান করেন অদ্বৈত। এই শিবই কল্যাণ ও রুদ্রের রূপে ধ্বংস করে। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির প্রেমময়তার সঙ্গে এর যোগসূত্র ভারতবর্ষীয় সনাতন রাজনীতিরই অংশ। এজন্যই সম্ভবত অদ্বৈতর বর্ণনায় পাই, গানের আসরে 'কৃষ্ণমন্ত্রী শিবমন্ত্রী দুই মতের লোকই আসিয়াছে।'

প্রবাস হচ্ছে নবতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও পূর্বতন সম্পর্ক অস্বীকারের কাল। সুকদেবপুরের খলায় বসন্ত আসে, আসলে আসে অর্থনীতির বিশেষ মৌসুম। এসময় নারীর কাছে জেনে নেওয়া যায় মুগাচণ্ডী ফুলের নাম, আসলে তো নতুন এক মুখদর্শন। তখন কিশোরের কাছে প্রতিদিনের পরিচিত বাসন্তী একটি ভুল নাম — সর্বোচ্চ 'ভইন'। বসন্তের দোলা আসে দোল পূর্ণিমার উৎসবে, রঙের খেলায়, মিলনের মৌসুম হিসেবে। বিশেষত সমাজের পরিচিত গণ্ডির বাইরে তারা সুখের নতুনতর মাত্রা খোঁজে, পরিচিত পরিমণ্ডলকেই যেন বিদ্রূপের দ্বারা সুখকে দোহন করতে চায়। এই প্রচেষ্টা কার্নিভালের জমাট জমকালো রঙের অপরিচিতির মাঝে নিয়ে যায়; তিলকের ভাষায় :

> খলাতে দোল-পুন্নিমার খুব আরব্বা হয়। মাইয়া লোকে করতাল বাজাইয়া যা নাচে! নাচেত না, যেন পরীর মত নিত্য করে। পায়ে ঘুঙ্‌রা, হাতে রাম-করতাল। এ নাচ যে না দেখ্‌ছে, মায়ের গর্ভে রইছে। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ৬৩]

সনাতন পোশাকি বন্ধন, আভিজাত্যের অহং, পরিচিত ট্যাবু, অবদমন এসব উৎসবে বানচাল হয়। বিয়ের আসরগুলোতে যেমন সমাজের ফাঁক গলে যৌনতার উদগীরণ ঘটে, যেন শিক্ষণীয় কিছুর ইঙ্গিত দেয়, তেমনি এইসব দোল উৎসবেও ঘটতে পারে। তবে সমাজের প্রান্তে বা খলাতে হওয়ার কারণে বন্ধন আরো শিথিল হয়। তারা অবচেতনের ক্ষোভও যেন এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকে। এরা রাধা ও কৃষ্ণের দলে বিভক্ত হয়ে যে ভাষায় পরস্পরকে আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণ করে তাকে উৎসবের বাইরে ভাবে না। অবদমিত আবেগের সামূহিক অভিব্যক্তির কালেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, উৎসবকে বেদনার দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেন। উৎসবে এসে প্রতিপক্ষের আক্রমণ এবং কিশোরের নাম না-জানা এক মেয়েকে রক্ষা ও তার প্রতি প্রণয়াবেগ প্রকাশের দ্বারা অদ্বৈত মল্লবর্মণ কৃষ্ণস্মৃতিই ফিরিয়ে আনেন। মাঠে-প্রান্তরে যে মালা বদল তার কি সমাজে কোন মূল্য আছে? কৃষ্ণ কি রাধার মূল্য দিতে পারে? আমরা নতুন এক রাধাপ্রতিমার সাক্ষাৎ পেলাম, তাকে হরণ করবে মেঘনার ডাকাত, আর কৃষ্ণ-কিশোর হবে আত্মবিস্মৃত।

আত্মবিস্মৃত ছিলেন না অদ্বৈত মল্লবর্মণ — দুটি উৎপাদন ব্যবস্থার সংঘাত ও সমন্বয়ের দৃষ্টান্তের দ্বারাই তাঁর দৃষ্টিপথ বিকশিত হয়েছে। মোড়লের সঙ্গে ক্ষমতা ও

অর্থনৈতিক সংঘাত মালোদের নিয়েই অপর মালোদের সঙ্গে, বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও শৈব কাঠিন্য ও সংঘাতে জড়াতে হয় তাকে। কিশোরদের মতো মালোরা মোড়লের বিলের মাছ ধরার রায়ত মাত্র, অর্থনীতির প্রচলিত বৃত্ত এখানে জল নয় বৈষ্ণব প্রেমেও ভেসে যায়নি। রায়তেরা খলানির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঁধা, এটা ডাকাতি নয়, রুপোর টাকা গণনার নিয়ম। সত্যিকারের ডাকাতও আছে, তাদের হাতে চলে গেলে মৌসুমের বেসাতের দু'শ টাকা আর প্রেম তখন মন, প্রকৃতি বা অর্থনীতির দিক পাওয়া কঠিন। জলে বা ডাঙায় কোথাও স্বস্তি নেই দরিদ্র মানুষের; নিয়মের চাপে-থাকা মানুষগুলো তখন মুক্তি খোঁজে আলগা উৎসবে, নিজেদের জড়িয়ে নিতে চায় দূরস্থিত কোনো রঙিন স্মৃতির চাদরে। এরই ধারায় চার বছর পরে আসে অনন্ত ও তার মায়ের কথা। কিশোরের সন্তান অনন্ত অর্থাৎ বৈষ্ণবীয় প্রেমকাঠামোয় সামান্য ভাঙন ধরল; সে মায়ের সঙ্গে নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গকে অবলম্বন করে পৌঁছে যায় পিতৃধাম গোকর্ণঘাট। অনন্তর মার যাত্রা যেন কৃষ্ণ সন্ধানে অথচ মায়ের কোলেই অনন্ত ভবিষ্যতের কৃষ্ণরূপে বাড়তে থাকে। রাধা ও কৃষ্ণের এই আবর্তন অদ্বৈত মল্লবর্মণের নিকট জীবনাবর্তনেরই অপর নাম। অনন্তর ছোট নদী থেকে বড় নদীতে আগমন, বিস্ময়ভরা চোখে অবলোকন ও একাত্মতা জীবনের গতিশীলতার কথাই বলে দেয়। যাত্রাপথে অনন্তর 'চোখের সামনে জাগিয়া রহিল শুধু একটা নদী। সে নদী তার সকল সত্তাকে, সারা অনুভূতিকে লূতাতন্তুর মত টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। ভূত-ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া সে এই সদ্যজাগ্রত মুখর বর্তমানের স্রোতে ভসিয়া চলিয়াছে। তার প্রকৃত যাত্রা যেন শুরু হইয়াছে এইখান থেকে।' অনন্ত যখন নদীতে দেখছে তার জীবনের রূপকল্প, তার মা সেসময় স্মৃতিতে ডুবে আছে — মনে পড়ছে কিশোরের সঙ্গে তার মিলনের ক্ষণগুলো, বিশেষত শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি। আর গোকর্ণঘাটে পদাপর্ণের আগেই কাকতাল : 'একটা পাগলকে দুই বুড়াবুড়ি টানিতে টানিতে ঘাটের দিকে লইয়া আসিতেছে। পাগল একটা যুবক।'

গোকর্ণঘাটে জমি কিনে স্থায়ী বসতি করল অনন্তর মা। এই সমাজে রাজনৈতিক-অর্থনীতির শক্তির প্রদর্শনের ব্যাপারটি প্রকাশ্য ও প্রবল; কালোর মায়ের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও বাসন্তীর অন্তরের টানের ভেতর দ্বৈততা আছে, তবু অস্বাভাবিক নয়। কিশোরের কৈশোরের রাধারূপ বাসন্তী এখন সুব্লার বউ, যদিও সুবল মৃত্যুবরণ করেছে। রাধা-মনস্তত্ত্বের দুই নারীর মনের মিল সহসাই ঘটল। নারীতে-নারীতে ঘরে-ঘরে মনের কথা একরকম বিনিময় হয়ে গেলেও সমাজে গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক কাজ পুরুষদেরই হাতে। দশজনের সভা বসে, কৌম সমাজের বৈশিষ্ট্য এই সমাজ ও মাতবরদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিবাদেরও সুযোগ নেই। সভা আসলে বড় মানুষদের — বড় কেউ টাকার জোরে, কেউ বুদ্ধিতে, গায়ের জোরে বা ভাইয়ের জোরে, কেউ কূটকৌশলে। সমাজকর্তৃত্বের রূপরেখাটি সহজাত কৌশলে তুলে আনেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। সবচেয়ে বড় মাতব্বর রামপ্রসাদ, কালোর বাপের সঙ্গে অর্থনৈতিক বা ক্ষমতার বিবাদে জড়িয়ে ভিন্ন গ্রাম যাত্রাবাড়ির বাসিন্দা। সুব্লার বউয়ের চোখে রামপ্রসাদ 'শিবের মতন চোখ, মনিগোঁসাইয়ের মতন দাড়ি'। শিব আছে তাদের সম্মান ও কর্তৃত্বের স্মৃতিতে এবং কৃষ্ণ আছে প্রেমময় জীবনাচারে। অথচ এই সভাতেই কর্তব্যক্তি আছে দয়ালচাঁদ বা কৃষ্ণচন্দের মতো লোকেরা যারা 'শ্বশুরের বিছানায়

বউ শোয়ায়, জামাইর বিছানায় শাশুড়ী শোয়ায়'। সাধারণ মানুষ কি নেই? আছে, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর নেই। অদ্বৈতর ভাষায় : 'আসরের চারিধারে আর যত সব নর-নারায়ণ, তারা কেবল কথা শোনার লোক, তামাক টানার লোক।' তবু এই সমাজেই অর্থনীতির, সংস্কৃতির বা নৈতিকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয় এবং এর ফল পাওয়া যায় কেবল ঐক্যবদ্ধতার কারণে। সংহত একটি সমাজ আদিম-প্রায় অর্থনৈতিক উপজীবিকা নিয়ে বসবাস করছে কিন্তু চারপাশ থেকে ঘনিয়ে আসছে নবতর ক্ষমতা ও অর্থনীতির ঘূর্ণাবর্ত। সমাজে সেই সংকট-প্রসঙ্গের উত্থাপন ঘটে :

> ... ঘরের মালিক তার বসিন্দা। কিন্তু মাটির মালিক জমিদার। জমিদারের সঙ্গে সে-বাড়ির কোনো যোগ নাই। সে থাকে তার রাজসিক ঐশ্বর্যের মাঝে ডুবিয়া। তহসিলদার রাখে। সেই আদায়পত্র করে, আদায় না হইলে নালিশ করিয়া প্রজা উচ্ছেদ করে জমিদারের সই লইয়া, সে-ই। প্রজা উচ্ছেদ হয়, সে জায়গাতে আরেক প্রজা আসিয়া বসে। জমিদার নিজে আসিয়া সেখানে বাড়ি বাঁধে না। বাঁধিলে অনেক জমিদারের প্রয়োজন হইত। তারা সত্য নয় বলিয়া তারা সংখ্যায় কম। মানুষের মধ্যে তারা ব্যতিক্রম। রায়তেরাই সত্য। তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাটির মালিক হয় তারাই। কাগজপত্রের মালিক নয়, বাস করার মালিক। সেইরূপ তিতাসের মালিক জেলেরা। কাগজ-পত্রের মালিক আগরতলার রাজা। মাছ ধরার মালিক মালোরা। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ১১৫]

এই হল সামন্ত অর্থনীতির সাধারণ চক্র। চক্রের শীর্ষ-কেন্দ্রে থাকা ভোগবিলাসের জীবনধারী মানুষগুলো ক্ষমতার চর্চা করে, নিয়ম বা আইন তৈরি করে এবং শোষণের পথ ও প্রবণতাকে জটিল করে তোলে। একদা যা ছিল ঐচ্ছিক উপঢৌকন, তাকে বার্ষিক উপঢৌকনে পরিবর্তিত করেও তৃপ্ত হয়নি রাজা, খাজনার বন্দোবস্ত করেছে। এই সংকটের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আরো কিছু অপ্রিয় সামাজিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা হবে সভায় কিন্তু ক্ষমতাধর সভাজনদের কেউ কেউ আলোচনা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে 'শোনার ও তামাক টানার' দলে আড়মোড়া ভাঙে। তারা সোচ্চার প্রতিবাদে যেতে পারে না কিন্তু আচরণে তার পথ বের করে নেয়; লেখকের ভাষায় : 'এই অব্যক্তের দল ঠিক প্রতিবাদ জানায়। কোথাও হাসিয়া, কোথাও কাঁদিয়া, কোথাও শিষ্ দিয়া। ... গোকনঘাট গ্রামের মালোদের সাধারণ স্তরের লোকেরা মাতব্বরের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল সেদিন হুকা টানিবার ছলে অনেকে এক সঙ্গে কাসিয়া।' তখন দশজনের সভা বাধ্য হল কৃষ্ণচন্দ্রের অপকর্মের তিরস্কার করতে — 'মাতবরগিরির মানমজ্জাদা তুমি বুঝি আর রাখতে চাও না' এবং কৃষ্ণচন্দ্রও লজ্জিত হল। এই সভাতেই মালোদের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত এল বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে। মালোরা মাছ ধরে, বিক্রি করে কিন্তু বাজার বসায় ও তার মালিকানা থাকে জমিদারের হাতে। অথচ অর্থনীতির হিসাবে উৎপাদন ও বাজারের সমন্বয় না ঘটলে পুরো ব্যবস্থাপনাই ভেঙে পড়বে। আজকে যখন জমিদারের লোক আনন্দবাজারে মালোদের কাছে মাশুল চাইতে শুরু করেছে তখন এই বাজারের অতীত উদ্ধার করে মোড়ল রামপ্রসাদ। শহরের দুই জমিদার জগৎবাবু ও আনন্দবাবু নিজেদের নামে দুটি বাজার প্রতিষ্ঠা করে তার জমজমাট অবস্থায় মালোদের সাহায্য চায়। সামাজিক ঐক্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনশ টাকায় বিক্রি হয়নি রামপ্রসাদ জগৎবাবুর লোকদের কাছে বরং প্রত্যেক মালো পঁচিশ টাকা ও একটা ধুতি নিয়ে আনন্দ বাজারে উপস্থিত হয়।

সেই বাজারে আজ মালোদের নিকট মাসুল চায়! অর্থনীতির গতি হয়ত এমনই, অথচ মোড়লও আপন অর্থনৈতিক ক্ষমতা না হোক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত :

> শুন বেপারী, বাবুরে সাফ্ কথা কইয়া দিও, মালোরা মাছ বেচতে কোনো সময় মাশুল দেয় নাই, দিবেও না। জায়গা দেউক আর নাই দেউক। মালোরা বাজার যেমুন জমাইতে জানে। তারা যেখানে যায়, আ-পথে পথ হয়, আবাজারে বাজার হয়। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ১১৮-১১৯]

ঐক্য ও ক্ষমতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল। তবে একথাও সত্য নবতর অর্থনীতির চাপ আসতে শুরু করেছে। অর্থনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির অনিবার্য যোগের কারণে সংস্কৃতিও চাপে পড়বে। সনাতন সমাজে মালোরা অচ্ছুৎ, ব্রাত্য-প্রায়; দ্বিজদের নিকট মালোরা দূরবর্তী স্বধর্মী। অথচ বাজারের কাছাকাছি বাড়ির তামসির বাপের বাড়িতে এসে কায়স্থরা তবলা বাজায়, মেয়েদের দিকে নজর দেয়। সমাজের সম্ভ্রমহানির এই ঘটনায় তামসির বাবা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। সবার শেষে আসে অনন্তর মায়ের সমাজে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপার, কিন্তু জ্ঞাতিপরিচয়ের অনিশ্চয়তার কারণে তাকে সবাই সমাজভুক্ত করতে অস্বীকৃত জানানোর পর মঙ্গলা সমাজে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সুব্লার বউ, কিশোরের বাবার সঙ্গে অনন্তর মা'র সমাজভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি যথাস্থানে উপস্থিতির দৃষ্টান্ত।

মালোদের পাশেই বসবাস করে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়। রাতে দিকভ্রান্ত রামপ্রসাদ উপস্থিত হয় বাহারুল্লার উঠানে। দুজনেই সুখের, ঐক্যের স্মৃতি হাতড়ায় কিন্তু বর্তমানে দেখতে পায় দুর্দশার চিত্র। বাহারুল্লা জানায় — 'চাষীরা কেবল দেনায় জড়াইয়া যাইতেছে। লোন কোম্পানীর টাকা আনিয়া কত চাষী আর শোধ করিতে পারে নাই বলিয়া প্রতি কিস্তিতে কত শাসানি কত ধমক খাইয়া মরিতেছে।' অর্থনীতি বললেই হয় না, বলা যায় পুঁজির রসচক্রে পাক খেতে শুরু করেছে কৃষিজীবী সমাজ। এটাই অর্থনীতির নতুন ধারা, এর আক্রমণে আদিম ধরনের সংগ্রহবৃত্তিতে অভ্যস্ত একটি গোষ্ঠী বা সমাজ তার পেশা কেবল নয়, সংস্কৃতিসহ সামগ্রিক অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। এই তথ্য অন্তরে ধারণ করেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ সমাজে শিক্ষার গুরুত্বের দিশা দেন, কিন্তু মালোগোষ্ঠী তখনও নির্বিকার। শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকদেরই সহায়তা করে, তবু একজন কৃষকই প্রথম বোঝে শিক্ষার গুরুত্ব। বাহারুল্লা মনে করে চারপালা কবিগান ও চারপালা যাত্রার খরচ দিয়ে মালোরা ইচ্ছে করলেই একটা স্কুল করতে পারে, কিন্তু রামপ্রসাদ জানায় 'মালোরা পুলকে বাঁচে না, তারা দিব স্কুল।' শিক্ষার সঙ্গে ক্ষমতার যোগসূত্র অনুভব করেছে কৃষকেরা। খাজনায়, মহাজনে তারা মাঝে মাঝে বেসামাল হলেও স্থায়ী আশ্রয় কৃষকেরাই তৈরি করতে পারে, রামপ্রসাদ বলে, 'জোয়ারে বাড়ে ভাটায় কমে, জলের আবার একটা বিশ্বাস। মাটির সাথে সম্বন্ধ ছাড়া মানুষের জীবনের কোন বিশ্বাস নাই, বাহারুল্লা ভাই।' এই রামপ্রসাদের ভাবনার দ্বারাই কাহিনিতে জন্ম-মৃত্যুদর্শনটি প্রত্যক্ষে আসে। সমাজের সভার পর পথভুলে বাহারুল্লার উঠানে পৌঁছানোর আগে পোড়ো বাড়ির দৃষ্টান্তে রামপ্রসাদের মনে জেগে ওঠে প্রবংশহীনতা ও মানবজীবনের নিয়তির প্রসঙ্গ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই বোধকে আরো বিস্তৃত করেছেন 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' অধ্যায়ে। এই অধ্যায়টি লোকজীবনের উৎসবে যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তেমনি অদ্বৈতর শিল্পচেতনার অন্যতম

প্রান্ত উৎসবে বেদনার কূটাভাসকেও ধারণ করেছে। অনন্তর মায়ের সামাজিকীকরণ বিভিন্ন পালাপার্বণ, পূজা, বিয়ে ও সন্তান জন্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির ভেতর দিয়ে পরিণামে মৃত্যুর অনিবার্যতা লাভ করে। এর ভেতর দিয়ে অনন্তর সামাজিকীকরণটিই মূলত স্থায়ীরূপ লাভ করে। এই সমাজেই জীবনের দুই স্রোত; একদিকে সন্তানহীনতা, বংশ লোপ পাওয়ার আশঙ্কা; অন্যদিকে ফলবান পরিবার, সন্তান আসে নিয়মিত বিরতিতে। কালোবরণের পরিবার দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। এখানে সন্তান আসে, ছেলেই প্রধানত, কৃষ্ণরূপে; নারীরা মেয়ের জন্য তিন ও ছেলের জন্য পাঁচ জোকার দেয়, অশৌচ অন্তে পায়ে ধান সরিয়ে গৃহপ্রবেশ ঘটে এবং গান হয় 'দেখ রাণী ভাগ্যমান, রাণীর কোলেতে নাচে দয়াল ভগবান।' অর্থাৎ শিবে-কৃষ্ণে বিমিশ্রিত। এখানে বিয়ে হয় টাকার জোরেই প্রধানত, এজন্যই তিন ছেলের বাবা প্রৌঢ় শ্যামসুন্দর বেপারী কাঠের কারবারে টাকা জমিয়ে চতুর্থ বিয়ে করে। অসম বিয়ের এই সংকট অনন্তর দৃষ্টিকোণে বর্ণনা করেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ :

> সামনে যে টোপর মাথায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে, সে বিরাট এক দৈত্য। ছোট মেয়েটাকে তার দলের লোকেরা ধরিয়া আনিয়া তার গুহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েটা চাহিয়া দেখে চারিদিকে লোকজন, পালাইবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না। তার চেয়ে এই ভাল। আপাততঃ দৈত্যকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তার মাথায় ছড়াইয়া তাকে তুষ্ট রাখা চলুক। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ১৪০-১৪১]

ক্ষমতার দম্ভকে রূপ দিচ্ছেন অদ্বৈত। এই দম্ভের সঙ্গে বর্তমান শৈব ক্ষমতাধর অর্থনীতির কূটাভাসিত যোগ আছে নিশ্চয়ই। ব্যবসায়ে অর্থ সংগ্রহের পর বিয়ে, অথচ ভোগের মানসিকতা আদি শৈবচিন্তার বৈপরীত্য তৈরি করে। শিব ছিল কল্যাণের দেবতা, এই কল্যাণ সমাজে অর্থনীতিতে সর্বোপরি আমাদের কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলোতে। এজন্যই মেয়েরা শিবের মতো আত্মভোলা বর প্রার্থনা করেছে। এখন যখন বিয়েতে নাপিত ভাই এসে 'গুরুবচন' পাঠ করছে তখন শ্লেষাত্মক পরিবেশ তৈরি হয় — 'শিবেরে পাইয়া উমা হরষিত হইল,/ সাঙ্গ হইল শিবের বিয়া হরি হরি বল।' শিব আছে মালোদের স্মৃতি ও স্বপ্নে, এই স্বপ্ন দাম্পত্যের ও পারিবারিক; আর আছে কৃষ্ণ, সে কেবল বিনয় ও ভক্তির, আত্মনিবেদনের — প্রেমের নামগান। কিন্তু শক্তির সাধনাও তাদের প্রয়োজন, এজন্যই কালিপূজায় সমারোহ সর্বাপেক্ষা বেশি। এই পূজায় রক্ত গ্রহণের ব্যাপার কিছু নেই বরং আছে হৃদয়ের রক্তক্ষরণের ইতিবৃত্ত এবং এখানে কর্মকাণ্ডে নারীরাই থাকে অগ্রণী। চারদিন পর্যন্ত মাছ-ধরা বন্ধ রেখে চলে কালীপূজার জাকজমকপূর্ণ উৎসব, সংহত সমাজের দৃষ্টান্তে সকলেরই এতে সাধ্যানুসারে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ থাকে; একারণে কিশোরের বাবা রামকেশবকে মাছ ধরার জাল পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়।

কালীপূজায় হয় আমোদ আর পৌষ মাসের উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে হয় খাওয়া-দাওয়ার উৎসব। এতে থাকে কৃষিজীবন ও সমাজের স্মৃতি ও বাস্তবতা। ফসল ঘরে তোলার পর সুবিধাজনক এই সময়ে সমাজ আরেকবার জেগে উঠে, মেতে উঠে গ্রামে গ্রামে নগরকীর্তনে। সারারাত ধরে মেয়েরা পিঠা বানায় প্রিয়কে ও দেবতাকে উৎসর্গের জন্য। এমনি এক উৎসবে রামকেশবের বাড়িতে অনন্তর মা, সুবলার বউ আর মঙ্গলার বউ রাত্রিকালীন পিঠা বানানোর অবসরে গল্পে মেতে উঠে এবং যে অর্ধাংশ জীবন বর্ণিত হয়

অনন্তর মার কণ্ঠে তার বাকি অংশ পূর্ণ করে সুব্‌লার বউ। এই 'পরস্তাব' সুবলার বউ আর অনন্তর মার যৌথ প্রকল্পের অংশ ও পূর্ণতার নাম। অনন্তর মা জানে একটা মানুষের হারানো পর্যন্ত, সুব্‌লার বউ জানে কিশোরের আত্মবিস্মৃত ও সুবলের মৃত্যু পর্যন্ত। কিশোর আত্মবিস্মৃত, বাসন্তীও আজ নেই, হারিয়ে গেছে সুব্‌লার বউ পরিচয়ের মাঝে। সুবলের মৃত্যুর জন্য কালোবরণের পরিবারকে দায়ী করে বাসন্তী এবং সেই ক্ষোভ সে গোপনও করে না। কিন্তু এই কাহিনির ভেতর দিয়ে আকস্মিক এক ঐক্য রচিত হলেও তা প্রকাশিত হয়নি, কেবল সুব্‌লার বউ শিহরিত হয়েছিল। দুই রাধার একজন বাসন্তী অবশ্য যশোদার রূপকল্পে স্থান পায় এরপর, 'ঘুমন্ত অনন্তকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সুব্‌লার বউ বুঝিতে পারিল এতক্ষণে সে মৃত্তিকা-স্পর্শ পাইয়াছে।' অন্যদিকে অনন্তর মা মনে করে পাগল ভালো হবে এবং তাদের পুনর্মিলনও সম্ভব। দোলের দিনে সে-কথা অস্পষ্ট রাখে না সুব্‌লার বউয়ের নিকট কিন্তু সুব্‌লার বউ মন ঠাণ্ডা করতে বলে এবং দুজনেই অবলম্বন করতে চায় অনন্তকে : 'এই অনন্তই আম্‌রার আশা-ভরসা। দুইজনে এরেই মানুষ কইরা তুলি চল।' তবু পাগলের জন্যই আকর্ষণ ঘোষিত হয় অনন্তর মার, 'পাগলেরে পাইলে তারে লখ্‌ কইরা জীবন কাটাই।' কিন্তু সমাজের ঐক্য, অনাচারের প্রতি ক্ষোভ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাসন্তী একলা চলার পক্ষপাতী; অদ্বৈত মল্লবর্মণ জানান, 'সুব্‌লার বউর মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে।' এই নারী ভাটার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে উজান ঠেলে, আর অনন্তর মার মনে বাসা বেঁধেছে 'সর্বনাশা সাংসারিক কামনা'। এইজন্য যেন কোনো এক দোলের দিনে অনন্তর মা আবির মাখাতে গেল কিশোরকে এবং কিশোরও তাকে কোলে তুলে নিয়ে আত্মবিস্মৃত আচরণের চূড়ান্ত করে। নারীর প্রতি এই অপমান সহ্য করেনি সমাজ; নির্বিচার প্রহারে আহত কিশোরের মৃত্যুর চারদিন পর অনন্তর মা-ও মৃত্যুবরণ করে। এভাবেই যুগলকিশোর কেবল নয়, সনাতন দাম্পত্যের সমাজমনস্তত্ত্বটিও কার্যকর হয়।

তিলক-কিশোর-সুবল-অনন্তর মার মৃত্যুর মাধ্যমে একটি পর্বের অবসান হল। কালের গতির প্রতিবন্ধকতা অদ্বৈত জানেন না; কিশোর ও মায়ের মৃত্যুর পর অনন্ত প্রথমে আশ্রয় পায় সুবলার বউয়ের কাছে। এই পারস্পরিক মানবিক আশ্রয় সমাজেরও মূলধন; হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা যেমন অদ্বৈত বলেন তেমনি বলেন কৃষক ও জেলের অর্থনৈতিক ধারার ঐক্য ও সমন্বয়ের কথাও। কাদির মিয়া আলু বোঝাই নৌকা নিয়ে বাজারে যাত্রা করেছিল, বৃষ্টির কারণে ডুবন্ত-প্রায় নৌকার উদ্ধারে এগিয়ে আসে ধনঞ্জয় ও বনমালী। এই উদ্ধারপর্বে হিন্দু-মুসলমানের দৃশ্যমান ঐক্যের দৃষ্টান্ত আছে, বনমালীর ভাবনা থেকেও এর পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু কাদিরের ছেলের মনে সনাতন সমাজে অপমানের স্মৃতি সক্রিয় থাকে এবং নৌকায় ঐক্যবদ্ধ ধূমপানের ব্যাপারটিও আগুনহীনতার কারণে মীমাংসায় পৌঁছায় না! হয়ত মনে বা কিছু আচরণে বিরোধ ছিলই, এখনও আছে, কিন্তু একই বাজার ব্যবস্থা, উৎপাদন ও শোষণের প্রক্রিয়ার কারণে মূলগতভাবে শ্রেণি-ঐক্য তৈরি হয়। অদ্বৈত এই প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বাপেক্ষা বেশি, একারণেই দুটি নৌকায় দুই ধর্ম ও পেশার প্রান্তিক মানুষগুলো একই যাত্রায় একই বাজারে পাশাপাশি উপস্থিত হয়। নিজেদের উৎপাদন ও শোষণের সমধর্মী কার্যকারণে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে; কাদির বলে, 'বেপারীর কাছে বেচি না। বড় দরাদরি করে আর বাকি নিলে পয়সা দেয় না।' বনমালীও জানায় :

'মাছ-বেপারীও এই রকম। জাল্লার সাথে মুলামুলি কইরা দর দেয় টেকার জাগায় সিকা। শহরে নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।' এইসব অর্থনীতির সূত্র, বাজারের কারসাজি; বাজার চলে গেছে মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে, উৎপাদক যথাযথ মূল্য পাচ্ছে না। এর অনিবার্য ফলাফলে উৎপাদক তথা জেলে বা চাষি সংকটে পড়ে। বাজার যখন উৎপাদকের হাতে থাকে না, যেমন এখানে বাজার জমিদারের, পণ্য কেনে দালাল এবং সবকিছু শহরে চলে যায় ও বেশি দামে বিক্রি হয়, লাভের সিংহভাগ চলে যায় তৃতীয় শক্তির হাতে।

মাতৃহীন কল্পনাপ্রবণ অনন্তর সঙ্গে বনমালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বাজারেই। বনমালীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সঙ্গে চলে যেতে চায় সে, অন্তহীন চলার মানসিকতা তার তৈরি হয়েছে পিতৃ-মাতৃহীন পারিবারিক কার্যকারণে এবং তা আরো বেগবান হয়েছে বাসন্তীর আবেগ সত্ত্বেও বাসন্তীর মায়ের রূঢ় আচরণের জন্য। তিনজনের পরিবারে বাড়তি একজনের খাবার যোগানো কঠিন বলেই মাতা-কন্যার ঝগড়ার উৎস হতে থাকে অনন্ত এবং সে আশ্রয় পায় লবচন্দ্রের বউ নিঃসন্তান উদয়তারার স্নেহচ্ছায়ায়। সুব্লার বউ এই নিয়ে কষ্টে পড়ে, বিপরীত ভাষায় জানায়, 'বিন্দার মা, একদিন ধইরা জন্মের শোধ মাইর দেই, কি কও।' অনন্ত আরেক মাসী উদয়তারার পিত্রালয়ে যাত্রা করে এবং এরদ্বারা সমাপ্ত হয় অনন্তর গোকর্ণঘাটের সংস্পর্শ। আবার বড়ো নদীর পথে অনন্ত। এরমাঝে গোকর্ণঘাটে মেয়েদের প্রতি অসম্মানজনক ইঙ্গিত প্রদানকারী তেলিপাড়ার পয়সাওয়ালা এক ব্যক্তিকে বাসন্তীর নেতৃত্বে হত্যা করে বার-গাঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়া হল। এর প্রতিশোধের জন্য বামুন, সাহা, তেলি, নাপিত ও কায়েতরা ঐক্যবদ্ধ হল এবং তাদের সহায়তায় এগিয়ে গেল মালোদেরই একজন, তামসীর বাপ। শাস্তির উপায় বের করতে গিয়ে দুই দিকে গেল তারা; প্রথমত ঋণদান সমিতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপ ও নির্যাতন, দ্বিতীয়ত, নারীদের বিশেষত বাসন্তীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন। অবশ্য তখনই বিষয়টির সমাধান হল না, সংকট ও বিরোধের গোড়াপত্তন হয়ে রইল।

উদয়তারার সঙ্গে অনন্ত উপস্থিত হল সাদকপুর। এখানেও সমাজে বৈষ্ণব ভাবধারা বিদ্যমান অথচ পুরো শ্রাবণ মাস গীত হয় পদ্মাপুরাণ। একই সম্প্রদায় কৃষ্ণ, কালী ও মনসার পূজা করে বিভিন্ন সময়ে ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণে। পদ্মাপুরাণের গানে সাধুবাবার নেতৃত্বে বনমালী প্রধান গায়ক। লোকসুরের রীতি-পদ্ধতি ব্যবহার করে এই জনসমাজ প্রাণের আকুতি প্রকাশ করে। এই গানের আসরেই সাধুবাবার চোখে পড়ে অনন্ত, 'অমূল্য রতনের ছেলে এই অনন্ত।... ইস্কুলে দিলে ভাল বিদ্যা পাইত।' পড়াশোনার দায়িত্বও সে গ্রহণ করতে চাইল এবং উপস্থিত মালোগোষ্ঠীরও তা মনঃপুত হল :

> মালোগুষ্টির মধ্যে বিদ্যামান লোক নাই, চিঠি লেখাইতে, তমসুকের খত লেখাইতে, মাছ বেপারের হিসাব লেখাইতে গোপালনগরের হরিদাস সা'র পাও ধরাধরি করি, ভাল ভাল মাছ খাওয়াই। এ যদি বিদ্যামান হইতে পারে মালোগুষ্টির গৈরব। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ২৪৩]

মনসাপূজার আয়োজনের পাশাপাশি চলে 'জালা-বিয়ে'র আয়োজন। এ একান্তই লোকায়ত সমাজের নারীদের অনুষ্ঠান যা কেন্দ্রীয় সামাজিক ভাবনা ও রীতিনীতিকে লঙ্ঘন ও শ্লেষ জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, যেন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। জালা-বিয়েতে ধানের চারা প্রধান উপকরণ;

লখিন্দরের মায়ের প্রদত্ত সিদ্ধ ধানের স্মৃতি যা একসময় লখিন্দরের জীবিত হওয়ার মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়েছিল। এই বিয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে, দীপদানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারাগুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়া প্রতিবার নিছিয়া-পুঁছিয়া লয়। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে আর একদল নারী গীত গাহিয়া চলে। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ২৪৫]

কার্নিভালের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসে এই জালা-বিয়ের ঘটনা। ভাটি অঞ্চলের জীবনে সাপ ও মনসা পূজার প্রাকৃতিক বাস্তবতা স্বীকৃত। তবু জালা-বিয়ের মতো লোকসাংস্কৃতিক উপাদান স্বতন্ত্র সমাজমনস্তত্ত্ব যোগ করে। মনসাপূজায় ব্যবহৃত হয় শাপলা এবং পূজার শেষেই পূজার সামগ্রীর মতো মনসাও অনাদরে পড়ে থাকে। শাপলা তখন শিশুদের খেলার সামগ্রী; অবশ্য অদ্বৈত সর্পচেতনায় লব্ধ যৌনতাকে আরো একটু দূরে নিয়ে নরনারীর জীবনযাপনে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেন। এ কারণেই অনন্ত ও অনন্তবালার আলাপ, আচরণ ও মানসিক বিকাশ অনেকটাই আকস্মিক, নাটকীয় ও বৈষ্ণবীয় ধারায় বিকশিত। রাধা তো জন্মেই প্রেমাকুল, সে তো কৃষ্ণের গলায় মালা দেবেই। তবে সংশয় থেকে যায়, মনসাপূজার শাপলায় তৈরি হওয়া মালার বন্ধন কতটা নির্বিষ হবে? অনন্তর জীবনে চতুর্থ নারীর সংস্পর্শ আসে অনন্তবালার দ্বারা এবং তা বৈষ্ণবীয় স্মৃতিকাঠামো ধারণ করেই প্রকাশ করেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাঙ্ক্ষিত দার্শনিক রূপাবয়বের প্রয়োজনে মালোজীবনের অনিবার্য প্রতিরূপ হিসেবে আসে কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা। অবশ্য মালোর জীবনের প্রাত্যহিকতা যতখানি ধর্ম-সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও পালাবদলের সূত্রে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার সুযোগ ঘটেনি কৃষিনির্ভর সমাজের ক্ষেত্রে। এছাড়াও কৃষকেরা এখানে প্রধানত মুসলমান, তাদের ধারাবাহিক বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি নিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ পূর্ণাঙ্গ অবহিত না-ও থাকতে পারেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই অদ্বৈত সার্বজনীন একটি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে কৃষিসমাজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। বিরামপুরের কাদির মিয়ার পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি; তার পুত্র ছাদির, পুত্রবধূ খুসি ও প্রপৌত্র রমুকে নিয়ে যে পারিবারিক পরিমণ্ডল তাতে ক্ষমতা, সামাজিকতা, নৈতিকতা, সম্ভাবনার বহু বিচিত্র দ্বার উন্মোচন করে দেখান অদ্বৈত মল্লবর্মণ। অল্পবয়সে প্রাপ্ত পুত্র নিয়ে আনন্দিত ছাদির, ছেলে রমুর সঙ্গে তার আদরের সম্পর্ক। ছোট্ট শিশু রমু যখন তার কল্পিত ভবিষ্যতে ব্যবসা করতে চায় তখন কৃষকের মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় ছাদিরের উচ্চারণে :

> বেপারীরা বড় মিছা কথা কয়। সাত পাঁচ বারো কথা কইয়া লোকেরে ঠকায়; কিনবার সময় বাকি, আর বেচবার সময় নগদ! আর যে পাল্লা দিয়া জিনিস মাপে, তারে কিনবার সময় রাখে কাইত কইরা, আর বেচবার সময় রাখে চিত কইরা। এর লাগি ত'র নানা বেপারীরে দুই চক্ষে দেখতে পারে না! তুই যদি বড় হইয়া ময়-মুরুব্বির হাল্-গিরস্তি ছাইড়া দিয়া বেপারী হইয়া যাস তা হইলে ত'র নানা ত'রেও চোর ডাকব আর — [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ২৬১]

ব্যবসায়ীর সঙ্গে পুরো সমাজ নয়, কৃষক সমাজের এই বৈরী সম্পর্ক অর্থনীতির বাস্তবতা মেনেই তৈরি হয়েছে। উৎপাদিত কৃষিদ্রব্যের বাজারমূল্য নিয়ে ব্যবসায়ীর কারসাজি কৃষকের

বহু পুরাতন অভিজ্ঞতা। কারণ এই কৃষিব্যবস্থার গর্ভ থেকেই সৃষ্টি হয় ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ের মূলধনই ধারাক্রমে আধুনিক পুঁজির রূপ লাভ করে। এতে শোষণের যে চক্র আছে তার প্রধান ভুক্তভোগী উৎপাদনকারী কৃষক। একই কারণে মালোরা পছন্দ করেনি ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ীদের। মালোদের ঘরে কোনো ভদ্রলোকের আগমন আমরা লক্ষ করিনি, এখানে ছাদিরের শ্বশুর একজন মূর্তিমান ভদ্রলোক, পেশায় মুহুরি। কৃষক সমাজে যৌতুকের সংকট আছে, তা মাথায় নিয়েই মুহুরি মেয়ের শ্বশুর বাড়ি আসে। কাদির মিয়া তখন মাগন সরকারের মিথ্যা মামলায় ক্ষুব্ধ, বিব্রত। ঘরে মুহুরি উপস্থিত কিন্তু কাদির মিয়া মিথ্যার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়তে চায় না; সত্যপথে থেকেই মীমাংসা করতে চায়। কৃষিসমাজে সংঘাতের প্রধান কারণ ঋণ, দেনার দায় ও বিভিন্ন মামলা; এগুলো সহজে সমাধানের পথেও প্রধান অন্তরায় প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা, যেখানে পথে পথে অনেক সুযোগসন্ধানী অপেক্ষা করে থাকে সর্বনাশের জন্য। একথা জানা থাকায় আইনের পথে যেতে চায় না কাদির মিয়া। এদিকে সমবয়সী দোলগোবিন্দের মৃত্যু মাগন সরকারের পরিবর্তনের সূচনা করে, যদিও তা ভাববাদী অভিপ্রায় হিসেবে পরিত্যাগের সুযোগ ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের। পরিবর্তিত মানসিক অবস্থায় কাদির মিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাগন সরকার জানায় :

> দোহাই কাদির মিয়া। শুধু একটি বারের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে সর্বনাশ তো অনেকেরই করিলাম। আর কারোর সর্বনাশ আমি করিব না, শেষ বারের মতো শুধু তোমার সর্বনাশটুকু করিতে দাও। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ২৭৩]

সম্মত হয় কাদির মিয়া; কিন্তু পরের দিনই মাগন সরকার মৃত্যুর জন্য নারকেল গাছ থেকে লাফ দেওয়ার মতো অনন্য ঘটনা ঘটায়। বিষয়টিকে অর্থনৈতিক প্রবণতা থেকে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় নিয়ে গেছেন ঔপন্যাসিক। কাদির মিয়ার এই মনোজাগতিক উদাসীনতার কালেই কৌশলে দৌড়ের নৌকা বানানোর জন্য চারশ টাকা খরচের সম্মতি আদায় করে নেয় ছাদির মিয়া। কৃষক ও মালোর খরচের প্রবণতায় পার্থক্য থাকে; নগদ টাকার অভাবে কৃষকেরা থাকে অনেকটাই হিসাবী, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে বিক্রি ও নগদ টাকার সুযোগ বেশি থাকায় খরচের ব্যাপারে বাড়তি সুবিধা পায় মালোরা। এছাড়া কৃষক অর্থের যোগানকে কৃষিজমিতে বিনিয়োগ করতে চায় সম্ভাবনার কার্যকারণে যা মালোদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। কৃষিসমাজেও থাকে বদ্ধতার আবহ; এমনি প্রবণতায় কাদির তার প্রপৌত্রকে শুরুতে মক্তবে পাঠাতে চায়নি, কেননা তার সামনে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের দৃষ্টান্ত স্বস্তিকর ছিল না; পুত্র ছাদিরকে জানিয়েছে সেই কথা :

> আর ইশ্‌কুলে পাঠাইলে, তোর শ্বশুরের মত মুহুরী হইতে পারিবে আর শাশুড়ীর বিছানায় বউকে ও বউয়ের বিছানায় শাশুড়ীকে শোয়াইয়া দিয়া দূরে সরিয়া ঘুষের পয়সা গুণিতে পারিবে। কাজ নাই বাবা অমন লেখাপড়া শিখিয়া। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ২৭৮]

অবশ্য পুত্রবধূর আবেগের কাছে নত হয়েই রমুর শিক্ষার ব্যাপারটি মেনে নেয় কাদির মিয়া। এই সিদ্ধান্তের ভেতর দিয়ে কৃষক সমাজও পরিবর্তনের দিকে যাত্রা করে। ছোট্ট শিশু রমুর মনে নৌকার মিস্ত্রীদের কথিত বরজের গানের সনাতন সমাজের বর্ণব্যবস্থা ও

জাতপাতের সংকট বিশেষ রেখাপাত করে। দীর্ঘ বর্ণনার নৌকাবাইচের পরিণামে আমরা পুনরায় অনন্তর সাক্ষাৎ পাই উদয়তারার সঙ্গে, সেখানে বাসন্তীও উপস্থিত হয়েছিল। অনন্তকে নিয়ে স্নেহের অধিকার সচেতন দুই নারী সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং বাসন্তী লাভ করে সর্বসমক্ষে প্রহারের গ্লানিকর অভিজ্ঞতা। উৎসব থেকে কোথাও সুখ উৎপাদিত হয় কোথাও হয় না, উৎসব নিয়ে সার্বজনীনতার একটি অভাববোধ অবচেতনে জারি রাখলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ — ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল বাসন্তী ও নৌকা হারিয়ে প্রাণে বেঁচে যাওয়া ছাদিরের ক্ষেত্রে ।

অদ্বৈত যাকে বিপ্লবী নারী হিসেবে তৈরি করলেন, তার অসম্মান ও অন্তর্দাহের ভেতর দিয়েই যেন সূচনা ঘটে মালো সমাজের অবক্ষয় ও ভাঙনের। পৃথিবীর সকল আশ্রয় হারিয়ে বাসন্তী নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায় মাতৃস্তনের স্নেহে, যে মায়ের 'স্তন দুটি শুখাইয়া দড়ির মত হইয়া গিয়াছে। মেয়ে তারই মধ্যে তার অলস স্তন দুটি ডুবাইয়া গভীর আরাম পাইল।' যে অসম্মানের সূচনা হল তাকে বিবর্ধিত করে ক্ষমতাধর লম্পট বামুন-কায়েতেরা। অসম্মানিত বাসন্তীর আত্মবন্দিত্বের ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড়াল, অবশ্য সামর্থ্য অনুসারে তার প্রতিবাদও করে বাসন্তী; এই প্রেক্ষাপটে অদ্বৈত মল্লবর্মণ আবার লেখেন 'সুবলার বউয়ের মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে।' প্রতিবাদী এই নারী দেখতে পায় মালোসমাজের ভাঙন, এর সূচনা ঘটে অনৈক্যে ও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হারানোর মধ্যে। মালোর দশজনের সভা মূল্য হারায়, অনুপ্রবেশ ঘটে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ ও কর্তৃত্বের; বৈষ্ণব পুরোহিত ব্রাহ্মণের মতো বিধবা বিয়ের বিরোধিতা করে এবং সমাজ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এখন মালো-নারীর অসম্মানের জন্য ব্রাহ্মণ-কায়েতদের বিচার করা যায় না ঐক্যের অভাবে, কিন্তু সুবলার বউ তার ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায় : 'আমি সব পারি। আর কিছু না পারি আগুন লাগাইয়া গাঁও জ্বালাইয়া দিতে পারি।' অপমানের বাঁচার চেয়ে সম্মানের মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে সে এবং চেষ্টা করে অসম্মানের প্রতিবিধানের জন্য ঐক্য ফিরিয়ে আনার। ঐতিহাসিকভাবে এমন সংহতিহীনতার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেই ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় শিক্ষার কুহক ছড়িয়ে পড়েছিল। 'কলকাতা বহুদূর' তবু সকল ভারতীয়র স্বপ্ন তা এবং সেখানে প্রবেশের সুযোগ দেয় অর্থ ও শিক্ষা। আর উনিশ শতকেই সৃষ্টি হয়েছিল প্রাণ-উত্তেজক প্রবাদ 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।' এ হল কূলের সন্ধানে কূল হারানোর ঔপনিবেশিক বিশেষ প্রক্রিয়া। সেই পথে পা বাড়াল অনন্ত, এক নাপতিনী পরামর্শ দিয়েছিল, সে যেন সেখান থেকে চলে যায় কারণ তাকে 'বামুন কায়েতের ছেলের মত এলে-বিয়ে পাশ করিতে হইবে।' স্বপ্নের শহরে শিক্ষার সুযোগ আছে এবং শীঘ্রই সে প্রার্থিত শিক্ষার সন্ধানে শহরে যাত্রা করল।

শিক্ষাকে মুক্তি না হোক গতিশীলতার অনিবার্য রূপকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। এই ভাবনার মূলে আছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক কর্তৃত্বের দৃষ্টান্ত। যে কারণে শিক্ষার প্রয়োজন ঠিক সেই কারণেই মালোসমাজ বাইরের আক্রমণের মুখে পড়ে, দেখা দেয় ঐক্যের ভাঙন ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও নবতর অর্থনৈতিক গতিপথের সন্ধান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলে, এই দুটিই মালো ও কৃষক-সমাজের সনাতন ভাবধারায় তৈরি করে অন্তর্ঘাত। এই কার্যকারণটি অদ্বৈত জানতেন কিন্তু তা প্রতিরোধের

কোনো সুযোগ বা উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না; বরং একে কালের অনিবার্যতা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে স্মৃতি, সম্পর্ক, কুল-হারানোর ভীতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অস্পষ্টতা অদ্বৈত কেন সকল অর্থনৈতিক বর্গের জন্যই একধরনের কাতরতা তৈরি করে। কোনো বর্গ যখন ভেতরের শক্তি অর্থাৎ তার অর্থনীতির ভিত্তি ও সাংস্কৃতিক মূল্যমান হারিয়ে ফেলতে থাকে, তখন তাকে রক্ষা করা যায় না — মালোদেরও সেই অবস্থায় পড়তে হয়েছে। মালোগোষ্ঠী যখন বৈষ্ণবগানের বিপরীতে যাত্রাপালাকে গ্রহণ করা নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন এটা আর একক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থাকে না, সামগ্রিক অস্তিত্বের পরিচয়ে পর্যবসিত হয়। দুর্বল অর্থনীতির কৌমসমাজকে বামুন-কায়েতের শিক্ষিত ও ক্ষমতাধর সমাজ স্বভাবত লোভ ও ক্ষণস্থায়ী জৌলুসের দ্বারা ঘিরে ফেলে। এও মাছ ধরারই কৌশল, টোপ ফেলে ছেকে-তোলা — এতে মৃত্যু অথবা ধ্বংস অনিবার্য। ক্ষমতাবানেরা অর্থনীতির কৌশলে সংস্কৃতিদখলের নামে ঐক্য ও মগজের স্বরাজকে বিনষ্ট করে, বিনষ্ট করে মানবিক সম্ভ্রম; একারণেই বামুন-কায়েতরা সুবলার বউকে বারবার অসম্মান করতে চায়। সে তাই শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আকুতি ঝরিয়ে আহ্বান করে :

> কিরে মহন, কি অ সাধুর বাপ, মধুর বাপ! ইটা আমার বাপের দেশ ভাইয়ের দেশ। ইখানে আমি কারুকে ডরাইয়া কথা কই না। ইখানে আমারে যেজন আজ্‌নাইবে, এমন মানুষ মায়ের গর্ভে রইছে। আমার কথা ছাড়ান দেও, আমি কই মালোপাড়ার কথা। দিনে দিনে কি হইল কও দেখি। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ৩১৪]

ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে একটা অংশ প্রতিরোধের চেষ্টা করে নিজেদের সম্ভ্রম, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। অর্থনৈতিক ও ক্ষমতার কার্যকারণেই সমাজের মাথা কালোবরণ চলে যায় যাত্রার দলে, যুক্ত হয় দয়ালচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরকিশোর। প্রবল বিরোধীপক্ষের বিপরীতে মালোরা কেবল সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হলেই রক্ষা পাবে না, রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূলে যে অর্থনীতি তা রক্ষারও চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষিত মানুষ, পুঁজির ক্ষমতা ও বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা মালোদের নিয়ে ভাবে না। অনন্ত কি ভেবেছে? বাসন্তী মালোজীবনের ট্রাজেডির মেরুদণ্ড, সে বেঁচে থাকতে চায় শেষ চেষ্টা ও আশাবাদের ভেতর কিন্তু পরিণামে তারা জয়ী হতে পারে না। একে আমরা অপরাজেয় মানবাত্মার প্রতিভূ বিবেচনা করতে পারি, বেদনাবোধ জাগ্রত রাখতে পারি কিন্তু বাঁচাতে পারি না। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাই সাংস্কৃতিক পরাজয়কে অর্থনীতির কার্যকারণে স্থান দিয়ে মালোগোষ্ঠীর লোন কোম্পানির হাতে নাজেহাল হওয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। বাজারের পালদের সাহায্য নিয়ে সবন্দুক পেয়াদা আসে, — রাষ্ট্রই তো পুঁজির বিকাশের দায় গ্রহণ করবে — অর্থ আদায়ের কৌশল হিসাবে মালোদের নামানো হয় তিতাসের জলে, কারণ তিতাসের জলে তারা মিথ্যা বলে না। এর মধ্যে তিতাসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ঘটে, দেখা দেয় চর। যে জল ছিল মালোদের দখল কেবল নয়, জীবিকার নির্ভরতা, চর জাগায় তা চলে কৃষকের দখলে এবং দূরদূরান্ত থেকে এল লাঠিয়াল বাহিনী, মালোরা সেখানে তীরে দাঁড়ানো দর্শক মাত্র। এই প্রেক্ষাপটে মালোদের অদ্বৈত ভেবেছেন আদিম ধরনের ভাসমান একটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যাদের ভিত্তির শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করেনি; অর্থাৎ মালোদের জীবিকা ও অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে ঔপন্যাসিক আশাবাদী হতে পারছেন না :

> পৃথিবীর বুকে মিশিয়া যতই তারা, জেলেরা, গাছপালা বাড়িঘরের সঙ্গে মিতালি করুক, তারা বাষ্পের মত ভাসমান। যতই তারা পৃথিবীর বুক আঁকড়াইয়া থাকুক, ধরার মাটি তাহাদিগকে সর্বদা দুই হাতে ঠেলিয়া দিতেছে, আর বলিতেছে, ঠাঁই নাই, তোমাদের ঠাঁই নাই। যতদিন নদীতে জল থাকে, ততদিন তারা জলের উপর ভাসে। জল শুখাইলে তারা জলের সঙ্গে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ৩৩১-৩৩২]

তবু রামপ্রসাদ চেষ্টা করেছে তিতাসের চরের জমি দখল নিতে কিন্তু সহযোগী পায়নি। সে সপুত্র বিবাদে জড়িয়েছে, সঙ্গে 'করম আলি বন্দে আলি প্রভৃতি ভূমিহীন কৃষকেরা' কিন্তু কাজ হয়নি; এতে মৃত্যুবরণ করেছে রামপ্রসাদ এবং জমি পায়নি বিবাদকারী কৃষকেরাও; 'তবে পাইল কে। দেখা গেল, যারা অনেক জমির মালিক, তাদের জোর বেশি, তিতাসের বুকের নয়া-মাটির জমিনের মালিকও হইল তারাই।'

ক্ষমতার দম্ভ ও আকর্ষণই প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। শিক্ষার অন্যতম একটি কূটাভাসও এর দ্বারা প্রকাশ পায়, ঔপন্যাসিক তাকেও অস্বীকার করেননি। কৃষ্ণময় অনন্ত চলে গেল শহরে শিক্ষা লাভের জন্য অথচ পেছনে পড়ে রইল অনন্তবালা, যখন সমাজ বলে : 'অনন্তবালা ঘরের পালা, তারে নিয়া বিষম জ্বালা।' অনন্তর খোঁজ পাওয়া গেল আরো সাতবছর পরে, তখন অনন্তবালার বয়স ষোলো। বনমালীর সঙ্গে কুমিল্লার রেলস্টেশনে অনন্তর সাক্ষাৎ হয়, তখন অনন্ত মূর্তিমান ভদ্রলোক — 'পরনের ধুতি ফরসা, জামা ফরসা। পায়ের জুতা পর্যন্ত পালিস করা।' আর বিশেষভাবে ভদ্রলোকদের কর্ম — তর্কই তারা করছিল কয়েক বন্ধু মিলে; এই কথার দ্বারাই আমরা চিনতে পারি উনিশ শতক ও তার পরবর্তী ভদ্রলোকদের। প্রথমে চিনতে না পারলেও পরিচয় দেওয়ার পর বনমালীকে চিনতে পারে, আদর-আপ্যায়ন ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থাও করে, আর বনমালী, বাসন্তী ও উদয়তারাকে একটা করে শাড়িও কিনে দেয়। অবশ্য অনন্তবালা যখন জিজ্ঞেস করে 'আমারে একখান দিল না? — এর উত্তর বনমালী কেন অদ্বৈত মল্লবর্মণেরও মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক বা শ্রেণিবৈষম্যের কার্যকারণে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু স্বপ্ন নিয়ে বাঁচবে অনন্তবালা, স্বপ্ন নিয়েই হারিয়ে যাবে। এই স্বপ্ন উসকে দিতে উদয়তারা গোকর্ণঘাটে ফিরে আসে অনন্তর দেওয়া বাসন্তীর জন্য একখানা শাড়ি নিয়ে এবং দুই যশোদা রূপকল্পের নারী একই স্বপ্নবিভোরতায় অপমানের স্মৃতি ভুলে মিলে যায়। উদয়তারা যেমন বলে, 'আমার ত ভইন কৃষ্ণহারা ব্রজনারীর মত অবস্থা। কিন্তু পরের পুত, তোরও পেটের না, আমারও পেটের না।' কিন্তু কৃষ্ণস্বপ্নে জীবন ধরে রাখতে পারেনি মালোর নারীপুরুষ, নদীর পরিবর্তনে পেশা ও জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন হয়। অনেকেই বাস্তুভিটা ত্যাগ করে, দিনমজুরে পরিণত হয়, বাসন্তী-উদয়তারা পানসুপারি বিক্রি করতে গাওয়ালে যায়, আর কেউ করে ভিক্ষা। তারা স্বপ্ন দেখে তিতাসে জোয়ার এলে তাদের জীবন-নদীর ভাটা কেটে যাবে কিন্তু তা আসে না; বরং অনিবার্যভাবে হানা দেয় ক্ষুধা ও মৃত্যু। মৃত্যুচিন্তাই করে এখন বাসন্তী; অপেক্ষার পালা শেষ না করেই অনন্তবালা পরিবারের সঙ্গে চলে যায় আসাম; তখন বাসন্তীর মনে হয় : 'উমা যেমন শিবের জন্য তপস্যা করিয়াছিল সেও তেমনি তপস্যা করিয়া চলিয়াছিল।' কিন্তু রাধামনস্তত্ত্বে এর ফল আসেনি। এর কার্যকারণ কি নাগরিক অর্থনীতি ও শিক্ষার কাঁধে বর্তায় না? যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তদের সাহায্যের জন্য পাশের গ্রামে আসতে পারে সে কি অনন্তবালা, বাসন্তী ও উদয়তারার মানবিক দায় গ্রহণ করবে না? হয়ত করবে কিন্তু তা হয়ত

সামগ্রিক বিবেচনার নৈর্ব্যক্তিক অংশ। এতে একান্ত মানুষগুলোর কষ্টের লাঘব হবে সামান্যই। তবু অন্তরে স্বপ্ন বেঁচে থাকে, যেমন অর্থনীতির চাপে অনেকে মরে গিয়েও প্রাকৃতিক নিয়মে দুজন বেঁচে আছে — বাসন্তী ও বুড়ো রামকেশব। এরা অনন্তরই আত্মার অংশ; এরা তাই স্বপ্ন দেখে মৃত্যুর আগে খাবার নিয়ে অনন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে অথচ সে অনন্তর সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। এই দূরত্ব কি কেবলই মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক নয়? ভদ্রলোকদের অর্থনীতির চাপে প্রতিদিন যে প্রান্তিক বর্গের মানুষ হারিয়ে যায়, তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করল বাসন্তী, অদ্বৈতর বিপ্লবী নারী — স্বপ্ন যার কখনো হারিয়ে যায়নি কেবল পরিবর্তিত হয়েছে, অথচ পরিণামে হতাশার চিত্র কানাকানি করে জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে বৃক্ষপত্রালীতে :

> ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরে আর একটিও ধানগাছ নাই। সেখানে এখন বর্ষার সাঁতার-জল। চাহিলে কারো মনেই হইবে না যে এখানে একটা চর ছিল। জলে থই থই করিতেছে। যতদূর চোখ যায় কেবল জল। দক্ষিণের সেই সুদূর হইতে ঢেউ উঠিয়া সে ঢেউ এখন মালোপাড়ার মাটিতে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু এখন সে মালোপাড়ার কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে। [অদ্বৈত, ১৩৯৮ : ৩৫০]

অথচ বাসন্তীর মনে হয়েছিল 'একমাত্র সত্য চরের ধানগাছগুলি। কি অজস্র ধান ফলিয়াছে। ... সেই দিকে চাহিয়া সুব্‌লার বউ ধীরে ধীরে চোখ বুজল।' স্বপ্ন তাকে আক্রমণ করেছে কিন্তু উদ্ধার করতে পারেনি। তার হাতের জলভর্তি পাত্র গড়িয়ে পড়েছে মহাকালের অদৃশ্য ইঙ্গিতে। এত ধান তবু ঘরে ঘরে ক্ষুধা ও মৃত্যুর কোনো মীমাংসা হয়নি। নাগরিক ভদ্রলোকদের দেওয়া দু-দিনের অনুকম্পার ত্রাণ নিতে হয়ত অনন্তর মতো মানুষেরা আসবে কিন্তু একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মেই প্রান্তিক মানুষের পেশা-জীবিকা বা উদ্বাস্তু হওয়া থেকে রক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারবে না।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের পরিণাম বিবেচনায় অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা সম্ভব এবং তা অদ্বৈত মল্লবর্মণ করেছেন আর্থ-সামাজিক বিদ্যমান গতিসূত্র মেনে। নদীনির্ভর যৌথজীবন অর্থনীতি নিরপেক্ষ নয়, তাদের একটি আক্রমণাত্মক বাজার ব্যবস্থাপনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে অথচ তা প্রতিরোধের সূত্র তাদের হাতে নেই। তবু জনমানুষের এই ব্যর্থতার চিত্রলিপিতে কি অদ্বৈত বিরোধীপক্ষ চিহ্নিত করেননি? নস্টালজিয়াকে অনেকখানি অবদমন করেও কি দেখাতে চাননি উদ্ধারের অসম্ভাব্যতা? এই উপন্যাসে বাস্তবতাই অদ্বৈতর শক্তি, তা ঐতিহাসিক, এবং তারই অভাব ছিল প্রথম দুটি উপন্যাসে। প্রথম দুটিকে তাই আমরা বিবেচনা করব অদ্বৈতর নগরজীবনের আত্মশ্লেষ হিসেবে, আর তিতাস তাঁর আত্মপরিচয়ের ট্রাজেডি; আরো গভীরে গেলে দেখা যাবে কোথাও তিনি ভদ্রলোকদের ক্ষমা করেননি, এমনকি অনন্তকেও নয়। আসলে জীবন শূন্যতা ক্ষমা করে না।

মূলপাঠ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ২০০০। *রচনাসমগ্র*, সম্পাদনা : অচিন্ত্য বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৩৯৮। *তিতাস একটি নদীর নাম*, পুথিঘর, কলকাতা।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অঞ্জন সেন/উদয় নারায়ণ সিংহ [সম্পাদক] ১৩৯৭। *উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব*, গাঙ্গেয়পত্র, কলকাতা।

অচিন্ত্য বিশ্বাস ১৯৯৯। 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ : একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত'; *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা।

গিয়াস শামীম ২০০২। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গৌতম ভদ্র ১৯৯৯। 'তিতাস একটি নদীর নাম : মালোর চোখে/তিতাস একটি নদীর নাম : মধ্যবিত্তের চোখে', *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা।

জহর সেনমজুমদার ২০০১। 'তিতাস একটি নদীর নাম : প্রেম ও পিপাসা', *উপন্যাসের ঘরবাড়ি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

জীবনানন্দ দাশ ১৯৯৮। 'Bengali Novel Today', *বিভাব*, সম্পাদনা : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কলকাতা।

জ্যোতিষ দাশগুপ্ত ১৯৯৯। 'সারা শরীরে অপুষ্টির ছাপ ছিল'; *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা।

তপোধীর ভট্টাচর্য ১৯৯৯। 'তিতাস একটি নদীর নাম : সাংস্কৃতিক প্রতিসন্দর্ভের সন্ধান'; *উপন্যাসের প্রতিবেদন*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য ২০০০। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

দীনেশচন্দ্র সেন ১৪১৫। *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* ২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় ১৪১৬। *বাঙ্গালীর ইতহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০৫। 'তিতাস একটি নদীর নাম : জল ও জীবনের বিকল্প নন্দন'; *উলুখাগড়া*, সম্পাদনা : সৈয়দ আকরম হোসেন, ঢাকা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ২০০৭। *চণ্ডীমঙ্গল*, সম্পাদক : সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।

মেসবাহ কামাল ২০০৭। 'ভূমিকা', *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, সম্পাদনা : মেসবাহ কামাল/জাহিদুল ইসলাম/সুগত চাকমা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৮১। *বাংলা দেশের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড, জেনারেল, কলকাতা।

শান্তনু কায়সার ১৯৮৭। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ১৯৮৪। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৩। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সাগরময় ঘোষ ১৯৯৯। 'ভেবেছিলাম একটি মৌলিক উপন্যাস লেখাব — হল না'; *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা।

সুকুমার সেন ১৯৭০। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুধীরচন্দ্র সরকার ১৪১২। *পৌরাণিক অভিধান*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা।

সুবোধ চৌধুরী ১৯৯৯। 'খাঁটি সোনা তাই ভেঙে গেল'; *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।

হরিশংকর জলদাস ২০০৮। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

[২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মশতবর্ষ সেমিনারে পঠিত]